উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

সেপ্টেম্বর ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

৫ বছর পেরিয়ে

নতুন আইন চা শ্রমিকের দুঃখ ঘোচাতে পারবে?

ঢাকিদের দিন এল আবার তবু তারা ঢাকশিল্পী নয় কেন?

ধারাবাহিক কাহিনি

তাজ্জব মহাভারত। মরা মৌমাছির চোখ

গল্প। যেখানে পথ বেঁকেছে

পাহাড় তবে কাহার?

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবসান নতুন আলো জ্বালিয়েছে বাংলার পাহাড়ে? না, আর গোর্খাল্যান্ড বলে গলা ফাটিয়ে লাভ নেই! গোর্খাল্যান্ড থাক আমার হৃদয়ে বা স্বপ্নে। আমরা বরং লাদাখের মত হয়ে যাই। পাহাড়ের তরুণ প্রজন্ম কি তাই চায়? বাম বা তৃণমুল, কিংবা ঘিসিং-গুরুংয়ে আর আস্থা নেই যাদের! দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় না যে বাংলার পাহাড়ে সেখানে গণতন্ত্র যে আজ অবসন্ন, বলাই কি বাহুল্য নয়?

নিরানন্দ ব্যাজার সংবাদ !

শহরে এখন গণপতির খিচুড়ি ভোগের লম্বা লাইন, মাতাশ্রী আসছেন মাস পেরোলেই। ‘উষ্ণায়ন’ অতি অশ্লীল একটি শব্দ, ভাদ্রের অভদ্র গরমে বাজার পথঘাট ঝিমোয়, মোবাইলে গেম খেলে খেলে ক্লান্ত কর্মচারি, তবু বাজার এখনও ব্যাজার। তবে ছাত্র সমাবেশের লাইন পর্যটনমুখী, এইবেলা চাউমিন মেরে ঘুরে নিতে হবে রাজবাড়ি। ফুটপাথ নেই, তবু নেতাদের মতই ভিড় দেখে মুখে হাসি ফোটে ফুটপাথ দোকানিরও। ওরাই তো বাজার, ইভিএমে কিংবা টাচপ্যাডে তর্জনি ছুঁয়ে ওরাই তৈরি করে দেয় তোমার নিয়ৎ। ওদের কখনও লেনিন বা নেহেরু পড়তে হয় নি, মানিক কিংবা তলস্তয় ! চারণ কবির কথায়, শিক্ষা সেতো কবে পাখি হয়ে হারিয়ে গেছে জঙ্গলে গুরুর খোঁজে গিয়ে। বিদ্যাঙ্গনে তাই মার্কস কিংবা ডিগ্রি বিলি হয় ফ্রি কিংবা চড়া দামে, আর ফাঁক পেলেই মাস্টার পেঁদিয়ে হাতের সুখ করে পুলিশ। এ বড় ভুল সময় হে বুঝলে, পঙ্গু গবেষকের দল প্রাচীন আতস কাচে চোখ রেখে মাথা নাড়েন, পিপীলিকার মুভমেন্ট মাপেন আর কার পশ্চাদেশে কোন রঙের পাজামা।

বণিকের ম্যাপে দেবভূমি হিমালয় আজ মানুষের ওপেন অ্যাডভেঞ্চার শপ। মারো গুলি তোমার বোগাস সেন্টিমেন্টে, নিয়ম মেনে এখন পা রাখতেই পারো তোমার ভগবানের মস্তকে। মারো লাথ তোমার পরিবেশ রক্ষার ইয়েতে, ১৩৭টি নিষিদ্ধ শৃঙ্গ টাঙ্গিয়ে দিয়েছে ‘হ্যাপি বিজনেস আওয়ার’ বোর্ড। উত্তরে সিক্কিমের মানুষ জানিয়ে দিয়েছে তাদের আপত্তির কথা, হিমাল কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে ফাজলেমি নয়। জানি না সেসব নয়া শাসকের ক্ষমতার উত্তাপে ধোপে টিকবে কি না। ওই চাঁদ আমার হাতের মুঠোয়, আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে ? বেঘোরে পত্নী হারিয়ে কাতর রামচন্দ্র শোনা যায় শেষ বনবাসের প্ল্যান করছেন, তবে তা হিমালয়ে নয়, বছর বছর মহাপ্লাবন হয়ে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন সাগরেই। সে হুঙ্কারে শৃঙ্গরাজ অবধি থরথর কেঁপে ওঠে, মেঘ ভাঙ্গা বাঁধ ভাঙ্গা বান তার ভূগোল বদলে দিতে পারে লহমায়। টাকা নয়, বাণিজ্য নয়, হিমালয়ের ছোট্ট দেশ ভুটান তবে কেন চাইছে আজ ‘গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস’ ? গবেষকের ক্ষয়াটে আতস কাচ তবু বৃথা ঘেঁটে মরে পরিসংখ্যান আর শতাব্দী প্রাচীন বস্তা, আর ঘন ঘন মাথা নেড়ে কয়, এ বড় কঠিন সময় হে, বুঝলে অবলাকান্ত !

উত্তরে এখন চিমসে গরম, রোদের প্রখর তাপ কেড়ে নেয় লড়াইয়ের প্রাণশক্তি। বৃষ্টির দেখা মেলে অতিথির মতই, দুই রাত্রি তিন দিনের সফর। কলকাতায় এসময় নাকি আবহাওয়া মনোরম না হলেও সহনশীল, বৃষ্টি নাকি কিশোরের মত খেলা করে দক্ষিণে ? অথচ গ্রীষ্মে ডুয়ার্স যখন বড় মনোরম থাকে তখন কলকাতায় পিচগলা বৃষ্টিহীন দুপুর। মানুষ তখন দলেদলে এনজেপি-বাগডোগ্রায় নামে একটু শীতল বাতাস পেতে। আমরা কেবল মিচকি হেসে বলি, ভাই দক্ষিণ আর উত্তর কি আর কখনও মেলে ?

সত্যিই এসময় ব্যাজার বদনে দর্শকাসনে বসে ধারাভাষ্য উপভোগ করা ছাড়া বিকল্প নেই। উৎসব সমাগত, ভাল থাকবার চেষ্টা করবেন।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৬য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ গৌতমেন্দু রায়

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
শিলিগুড়ির কথা ৬

প্রবাসী নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন
অবশেষে হেরিটেজ ডিগ্রি লাভ কোচবিহারের হারানো গৌরব কি ফিরিয়ে দিতে পারবে? ৮

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
কাশ্মীর কি গুবলেট করে দিল গোর্খাল্যান্ডের দাবি? ১০
ব্রিটিশ আমলের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট বদলাচ্ছে নতুন আইনে কি
সত্যিই চা শ্রমিক-মালিক সংঘাত মিটবে? ১২

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা
ডুয়ার্স গান্ধী যজ্ঞেশ্বর রায় ১৪

উত্তরের উপকথা
একটি প্রাপ্তবয়স্ক রূপকথা ১৫
ঢাকিদের ওই আসছে দিন! তবু ঢাকিরা ঢাকশিল্পী হলেন না কেন? ১৬

কবির কলমে
উত্তরকথা ১৮

পর্যটন
আমি খুঁজে ফিরি হাতিপোতার সোনালি দিনগুলি ২০

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ২২
মরা মৌমাছির চোখ ২৭

ডুয়ার্সের গল্প
যেখানে পথ বেঁকেছে ৩১

শ্রীমতি ডুয়ার্স
পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ বৈষম্য! ৩৬
খনা, এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টার অনিশ্চিত জীবনগাথা ৩৭

পাঠকের পর্যটন
কোচবিহার-শিলিগুড়ি নতুন এসি বাস ৪০

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ৫
রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

নির্মাল্য ঘোষ

শ্রদ্ধেয়া সাহিত্যিক শ্রীমতি তনুশ্রী পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘তিস্তা নন্দিনী গদ্য সংগ্রহ ২০১৯’ বইটি পড়ে শেষ করে ফেললাম। প্রথমেই বলি বইটির আঙ্গিক ও প্রচ্ছদের কথা— দুটোই আকর্ষণীয়। ধন্যবাদ জানাতে হয় শ্রীমতি সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য, শ্রীমতি বিদিশা চন্দকে এবং সাথে সাথে মুদ্রক অ্যালবাট্রসকে একটি মনোগ্রাহী আঙ্গিকের বই স্পর্শের অনুভূতি দেবার জন্য। বইটির রঙও খুব সুন্দর। সম্পাদিকা শ্রীমতি তনুশ্রী পালের ‘তিস্তা নন্দিনীর কথা’ একটি অমূল্য লেখা। এতে শুধু পত্রিকার লেখাগুলি সম্পর্কে আগাম আভাসই দেওয়া হয়নি, বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে— ‘তাই বলে মাতৃ ভাষা ভুলে যাওয়াটা নিজেকে শেকড় থেকে ছিঁড়ে নেওয়াই হয়। শেকড়হীন গাছ দাঁড়াতে পারে না বেশিদিন; লুপ্ত হয়ে যাওয়াটাই তার ভবিতব্য।’

সবগুলি লেখাই খুব উন্নত মানের। অর্ণব সেনের জলপাইগুড়ির জলছবি পড়ে আমাদের প্রিয় শহরের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সাহিত্য অনুরাগী ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। মৃদুল শ্রীমানীর ‘মহাপ্রাচীন ভারতে কন্যাজন্ম’, শ্রীমতি অদিতি হালদারের ‘স্মরণীয় ও বরণীয় সুনীতি বালা চন্দ’, শ্রীমতি সাগরিকা রায়ের ‘ভূত ভবিষ্যত’, শ্রীমতি রম্যাণী গোস্বামীর ‘কোজাগরী’, শ্রী অরুণাভ ভৌমিকের অনুবাদ গল্প ‘সেই বৃদ্ধা (জাপানি)’, শ্রী শৌভিক রায়ের ‘উত্তর বাংলার গদ্য চর্চা’ ইত্যাদি লেখাগুলো পড়লে মুগ্ধ হতে হয়। প্রত্যেকের লেখাই খুব ভাল, উন্নত মানের। আলাদা করে সবার নাম এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করতে পারলাম না বলে ক্ষমাপ্রার্থী। বাংলা সাহিত্যের গভীর নদীর বুকে ‘তিস্তা নন্দিনী’ পত্রিকার ডিঙি তরতর করে এগিয়ে চলুক নিরন্তর —এই শুভকামনা রইল। আর সবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ‘এখন ডুয়ার্স’ প্রকাশনাকে এত সুন্দর একটি গদ্য সংগ্রহ প্রকাশ করার জন্য।

মনোনীতা চক্রবর্তী

বিষাদ কি এভাবেও লেগে থাকে না?

মৃত্যুফাঁদের মধ্যে এত অলংকার ছিল, বুঝিনি তো আগে! এত কবিতা ছিল... গান ছিল... ত্রাস ছিল, বুঝিনি! অথবা, বুঝেছিলাম বলেই নীলপদ্ম ফোটানোর আগ্রহ ছিল মন্দ্র সপ্তক ছাড়িয়ে তার সপ্তকে! ছেঁড়া ছেঁড়া রক্তগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে আগলে রাখছিলাম নিজস্ব কিছু ভাঁজে! ‘এত প্রেম আমি কোথা পাবো নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে...’ রাখা নয়, থাকাও নয়! থেকে যাওয়াটাই সব! থেকে যেতে পারে ক'জন! কিন্তু এর মধ্যেও হরিতকি বনে শুনি এসরাজের করুণ! দৃঢ় হয় অকথিত মেঘ-রোদ-আলোর উচাটন! জামরঙের যে পোষা মেঘলা, করিডোর ভরায় যখন তখন, সেখানে একফালি কুমড়ো হয়ে এক নিপুণ আলো! আলোও তো ভালো হতে চায় কখনো কখনো! সব আলোই তো আর আলো নয়! সব প্রেম, সেও কি প্রেম! আসলে অনেক কিছুই অনেক কিছুর মত নয়, তবুও মিতালী! এই অনেক কিছু অনেক কিছুর মতো থাকে না বলেই অনেক ধাঁধার ভেতর চিনে নেওয়া যায় সেই চিরচেনা স্পর্শ... সেই কবে আর এক ‘আলোমানুষ’ তো বলেই গিয়েছেন “আছে তো হাতখানি...”! শুধু সঠিক হাতে হাত ছোঁয়ানোর রেওয়াজ! রেওয়াজ, এ কারণেই যে এতো এক তুমুল উপাসনা! তীব্র সমর্পণ! সাধনার সাধ মেটানোর অসম্ভব এক তাগিদ! প্রণম্য আগুন, রূপান্তরে যে তেপান্তর, তুমি তো সেই উজার... স্থির নদীর বিন্দু বিন্দু জমা জলে, যে ফনা তোলা আদর, ভিজে যাওয়ার তুমুল উৎসব, তার নাম ‘আলো’! নিবিড় আলোর উঠোনে তবু রাত্রিকালীন অনুযোগ দোলে প্রলম্বিত ছায়া হয়ে! অদ্ভুত আশ্চর্যে আমার আচ্ছন্ন শরীর ধারণ করো তুমি! প্রবল ঢাকের উছল! ধূপ-ধুনোর ঘোলাটে কাঁসরের আতিশয্য, টলোমলো সব! আমার গলা বুজে আসে, এক সময়, চিৎকার করতে, করতে! কাউকেই শোনাতে পারিনি, সবাই দেখেছে উপাচার আর উৎসবের মাহাত্ম্য, মহত্ব! ঠিক গত জন্মের দাহ'র বাসর থেকে যেভাবে টেনে তুলতে চেয়ে তুমি ছিটকে গিয়েছিলে আমার থেকে, আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম ধোঁয়া আর শব্দের গোপন ফাঁদে, কেউ বোঝে নি, আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম! এখনো মাঝে মাঝে শুনি একপশলা হাওয়ার মতো ডেনিম ব্লু আর সাদা রঙের টি-শার্ট পরে তাড়া দেওয়া সেই ডাক “আর কত দেরি করবে বন্যা?! কী যে করো না!” হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনি! চশমার ফ্রেমে লেগে থাকা হরফ মুদ্রিত হয়ে লেগে থাকে বুকের ভেতর! এমন সংখ্যাহীন আমাদের বেজে ওঠা এখন আর বিস্ময় চিহ্ন হয়ে দোল খায় না! দলাপাকিয়ে উঠতো যে যাবতীয় ঋণাত্মক, তা এখন কৌতুক! মানেবইয়ে জমি-আঁসমা পরিবর্তন! সিলেবাসটা যা ছিল, তাইই আছে! তাইই তো থাকে! শুধু শিক্ষকের বোঝানোর ভুলে অথবা অজ্ঞতায় বিষয়ভীতি অথবা আগ্রহ-এর জন্ম দেয়! গড়নে বড়ো মায়া! সহজাত আদর তাই ব্লিডিংহার্ট হয়ে তোমায় ছুঁয়ে ফেলে! আমাদের দুঃখগুলো, চোখের জলগুলো... এক এবং এক রকম! নৌকোটা এখন যে পাড়ে এসে নোঙর তুলেছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখো আবহমানের শব্দগুলো শস্য হয়ে খিলখিলিয়ে হাসছে, ভরিয়ে তুলেছে বন্ধ্যামাটি! আকাশ যেখানে চোখে ধরে আনন্দ জল, সেখানেই আমাদের মুক্তি স্নান... সেখানেই শাপমোচন... আমাদের মুক্তি স্নান-পুষ্পস্নান!

উত্তম কুমার মোদক

প্রভাতবৃত্তান্ত

দিন কয়েক হয়েছে, ভোরবেলা উঠে ঘোরাঘুরি চলছে। শরীরঘড়ি ভোর ৫টা বাজার আগেই জাগিয়ে দেয়। গোটা জুলাই মাসটা রোগেভোগে কেটেছে। তাই পুরোনো অভ্যাস মর্নিং ওয়াক পুনরায় শুরু।

প্রভাতবেলা, সহনশীল পরিবেশ কিছু সময়ের জন্যে মনোরম। আবহাওয়ায় প্রশান্তি, মৃদুমন্দ উত্তুরে বায়। গাছে গাছে কতরকম ফুলের সৌন্দর্যরচনা দেখে, বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মন।

ভোরের ফুলচোরেরা ফুল শিকার করে। দেখি, কিছু বলি না। এরা সব, ওপরে সৌন্দর্যকামী, ভেতরে ঘাতক। মান্না দে-র গানটি স্মরণ করুণ, ‘তবে কেন পায় না বিচার নিহত গোলাপ’।

আমাদের আলিপুরদুয়ার রেল-জংশন, জনপদ-হিসেবে প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর, সৌম্য সাজানোগোছানো। নিসর্গ, গাছপালা, পার্ক, মন্দির নিয়ে বৈচিত্র্যের আধার।

সকল স্বাস্থ্যপ্রত্যাশী মানুষের মতো আমি প্রাতঃভ্রমণে সামিল। যদি হাল ফেরে শরীরের। এই কয়েক বছরে আমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি। কুৎসিত চেহারা হয়েছে দেখতে। তবে মনটা, একই আছে। একটা পরিচ্ছন্ন প্রেমপ্রত্যাশী। সাহিত্য চর্চা প্রীতি। কোনোটারই খামতি হয়নি। শুধু চেহারাটা! মাঝে মাঝে হালকা অসুখে ঘায়েল হয়ে পড়ছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবার পণ করেছি, কিশোরবেলা ফিরিয়ে আনবোই। শরীরে না হলেও মনে-মনে। মন তো কোনো কিছুর অধীন নয়। কেবল ইচ্ছা শক্তির। তবে যাই, খোলা দুনিয়ার মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়াই।

কবিগুরু লিখেছেন, ‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া / হৃদয় মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সারা’।

কবসে খারা হু, জিন্দগিমে থোরা-সা, হুনি-অনহুনি হো যায়ে। থোরা ইনসাফ কি জিয়েগা!...

এক্কা

কী থেকে কী হইয়া গেল কে জানে, ভাইগণকে দেখা গেল হাসি হাসি মুখে দিদিকে বলিতে অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। অবশ্য ফ্লেক্সে এইরূপ লিখেন নাই 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় দিদিকে বলুন'। অনুপ্রেরণা থেকে অনুপ্রেরণা লইয়া কী ভাবে অনুপ্রেরণাকে বলিবেন? আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিবার জন্য। আমি কহিয়াছিলাম, যাহা বলিব শুন।

তারপর পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে একখানি শুনাইলাম। শুনিয়া ক্ষমতাবান যুবনেতা শুষ্কমুখে কহিলেন, আপনি বিজেপিকে ভোট দিছেন, জানি। কিন্তু এইরূপে হ্যাজাইবেন না!

বিজেপিও যে আমাকে সদস্য হইবার জন্য আসে নাই এমন নহে। তাঁহাদেরও সেই কবিতা শুনাইয়াছি। তাঁহার মহা খাপ্পা হয়ে বলিয়া গিয়াছেন, আগেই বুঝিয়াছি আপনি পাকিস্তানি!

যাহা হউক। ডুয়ার্সে কেহ যদি উক্ত আক্রমণ হইতে সহজে নিস্তার পাইতে চাহেন, তবে কবিতাটি শুনাইবেন।:—

দিতে পারি দু'আনা
দিবি মারিজুয়ানা?

দোক্কা

আলিনগর আর বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যদ্বয় প্রবল প্রতাপান্বিত সুগন্ধরাজের অধীনেই দিব্যি আছিল। বৈকুণ্ঠপুরে মাঝে মধ্যে প্রজাবিদ্রোহ ঘটিলেও সুগন্ধরাজ পারফিউম ছড়াইয়া সামলাইয়া দিতেন। তাহার পর 'পদ্মপ্রহারে দিকে দিকে/ ডাকিয়া উঠিল এক পিকে'। একবাক্যে বৈকুণ্ঠপুর হাইজ্যাক করিয়া রাজদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হইল মাধবের হস্তে। রাজমাধব তো ক্ষমতায় আসিয়া এমন কড়া কড়া ভাবনা ভাবিলেন যে বৈকুণ্ঠপুরে হাহাকার পড়ি গেল। ছোট ছোট রাজারা ভাবিলেন গণপদত্যাগ করিবেন। তাহার

বৈকুণ্ঠপুরে জোর ধাক্কা খেল সুগন্ধীর রথ

পর ভাবিলেন একুশ আসিতে দেরি আছে— তাই ত্যাগ না করিয়া প্রতিবাদ করিলেন। শুনা যাইতেছে রাজামাধব ইহাতে খুব একটা দমেন নাই।

বৈকুণ্ঠপুরের সুগন্ধাচারী দল ইহাতে খুব চটিয়াছে। রাজমাধবের হস্তে দণ্ড গিয়াছে বলিয়া আদি প্রজাগণ বহুকাল পর আহ্লাদে আটখানি হইয়া সুগন্ধাচারীদের পদ্মবনে যাইতে ইনসিস্ট করিতেছেন। নেহাৎ পিকে কূজিছে বলিয়া দ্বন্দ্ব লাগিতেছে না। তবে একেবারেই যে লাগিবে না, তাহা ভাবিতে চাহি না। না লাগিলে লিখিব কী? এই বিষয়ে পুরন্দর ভাটের হাইকুর উল্লেখ আবশ্যক—

পদ্ম চৌদিকে
নতুন ধানে পিকে
দ্বন্দ্ব এখন ফিকে।

তেক্কা

কোচরাজ্যের সভাসদ নৈশপ্রমাণবাবু কোথা হইতে একখানি পুষ্পক রথ আনিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আলোচনার শেষ হইতেছিল না। আলোচনা হইতে সকলে বুঝিয়াছেন যে, পুষ্পকরথ নামাইবার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রথ উড়িবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি না থাকায় তাহা আর উড়িতেছিল না। তাহার পর কী হইল জানা নাই, তবে বিমান চলিতেছে না জানিয়া কোচরাজ্যের মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

যাহা হউক। সম্মুখে পূজা। রাজ্যগুলি এইরূপেই চলিবে। তবে পূজায় কিছু উত্তেজনা হইতে পারে।

হতহাতি

ওদলাবাড়ির সন্নিকটে একখানি হস্তি বিদ্যুতের ছ্যাঁকা খাইয়া মরিয়াছে। তদন্ত করিয়া গম্মেন্ট বলিয়াছে, হাই টেনশান লাইনের তার হস্তিশুন্ডে লাগায় বিপত্তি। কিন্তু তার কীভাবে শুন্ডে লাগিল, তাহা জানা যাইতেছে না। এইরূপ হাইটেনশান তার উচ্চাবস্থিত হইয়া থাকে। হতভাগ্য হস্তি কি ততোধিক উচ্চতায় শুঁড়োত্তলন করিতে সক্ষম ছিল? নাকি সেলফি তুলিবে বলিয়া লাফাইয়া তার প্যাঁচাইয়া ঝুলিতে গিয়াছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তরে গম্মেন্ট বুদ্ধদেবের ন্যায় মৌন থাকেন। হাতি মরিলে কোনও দল নিজেদের সমর্থক বলিয়া দাবি করে না।

তা হাতি মরিলেও মন্ত্রী বলিয়াছেন, বক্সায় ব্যাঘ্র বর্তমান।

ভাবিয়া দেখিলে বক্সার ব্যাঘ্র বড় রহস্যময় বস্তু। শিবরাম একবার একখানি আধুলি কয়েক বার কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। উক্ত আধুলিতুল্য কোনও এক শয়তান ব্যাঘ্র ডুয়ার্সের ইতিউতি ঘুরিয়া গম্মেন্টের হিসাব গুলাইয়া দিতেছে বলিয়া অনেক সন্দেহ করিতেছেন। তবে মন্ত্রী যখন কহিয়াছেন, আছে, তখন থাকিতে বাধ্য। বিরোধিরা অবশ্য কহিতেছে, ঘণ্টা! বাঘ-টাঘ কিস্যু নাই। কয়েকটা সিভিক পুলিশকে বাঘের চামড়া পরাইয়া বক্সায় ছাড়া হইয়াছে। আহা! শুনিয়া পুরন্দরে অমর কবিতাখানি মনে পড়িতেছে—

বাঘের পায়ে হাওয়াই চটি।
টুরিস্ট আসে কোটি কোটি।।

ডিম রহস্য

তাহার পর বিডিও মশাই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দিকে চাহিয়া, মিটি মিটি হাসিয়া কহিলেন, 'অদ্য কতজন মিড ডে মিল খাইয়াছে বলিয়া আপনার ধারণা।

প্রধান হাসিয়া কহিলেন, 'ফর্টি সিক্স।'

'আচ্ছা।' বলিয়া বিডিও উঠিয়া পড়িলেন। প্রধান শিক্ষকের ঘর হইতে বাহির হইয়া এদিক ওদিক তাকাইলেন। না। কেহ লক্ষ্য করিতেছে না। তিনি পা টিপিয়া হাজির হইলেন পাকশালে। রাধুনিকে ফিসফিস করিয়া কহিলেন, 'কয়খানি ডিম রান্না করিয়াছ অদ্য?'

অকস্মাৎ সম্মুখে বিডিও দেখিয়া রাধুনি কাঁপিতে লাগিল। কোনওমতে কহিল, 'ছাব্বিশ খানি।'

বিডিও কালক্ষেপ না করিয়া ছুটিলেন হেড়ুর কক্ষে। হেডু খাতা বাহির করিয়া কী জানি করিতেছিল। বিডিও দেখিয়া শুষ্কমুখে কহিলেন, 'আপনি?'

বিডিও খাতাখানি লইয়া দেখিলেন মিড ডে মিলের হিসাবে জোড়াতালি চলিতেছিল। তখন তিনি বুঝিলেন, কী ভাবে মিড ডে মিল চুরি হইতেছিল।

এই রহস্য-রোমাঞ্চ ঘটনাটি ধূপগুড়িতে ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ।

দুজনকে অর্ধেক করে দিলে ডিম লাগবে চারটি

টুক্রাণু

ডুয়ার্সে হাড়জ্বালানি গরম পড়িলেও ইহার জন্য কেহ জহরলালকে দায়ি করে নাই। মিলিয়ন ডলারের জালি নোট লইয়া ঘোরতর জালিয়াতির চেষ্টা শিলিগুড়িতে। কোচবিহার হইতে ৭টায় বাসে চাপিলে শিলিগুড়ি পৌছাইতে পারেন ৮টায়। ইহার মানে এক ঘণ্টা নহে, তের ঘণ্টা। ব্লকে ব্লকে দলত্যাগী ঘাসফুলেরা নাকি পদ্মফুলের সহিত রফা করিয়া পুনরায় দলে ফিরিতেছে। ৩৫ জন চিত্রপরিচালক ডুয়ার্সে শুটিং স্পট খুঁজিবে। পাতলাখাওয়ায় গন্ডারদের জন্য বিচরণক্ষেত্র নির্মাণ— তবে গন্ডারদের প্রতিক্রিয়া মিলে নাই। কোচবিহারের গগনে বিমান না উড়িলেও বক্সার গগনে শকুন উড়িল বলিয়া!

ক্ষেত্রসমীক্ষা

জলশহরের পুরসমীক্ষার নতুন রিপোর্ট আসিয়াছে। রিপোর্ট সংক্ষেপ করিয়া পুরন্দর ভাট নোট দিয়াছেন—

করলার পানি আগের মতই বইবে
বোস, তুমি ফরগটন হিরো হইবে।

কলম সিং

পুঃ কলম সিং রচিত বাক্যে গুরুচন্ডাল দোষ খুঁজিবেন না। তাঁহার গুরু চন্ডাল ছিলেন। মিস্টার সিং তাঁহার আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন— 'আমার গুরু চন্ডাল/ নিবাস তাঁহার অন্ডাল।' ইহার পর আর কথা হইতে পারে না। ইতি। বিভাগীয় সম্পাদক।

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি মানে মাইগ্রেশন মহানগরী !

সৌমেন নাগ

শিলিগুড়ির কথা: দ্বিতীয় পর্ব

আজকের শিলিগুড়ি শহর তথা মহকুমার সূচনাকাল বলা যেতে পারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের সেই স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি এক বিশাল অংশের মানুষের সর্বহারা উদ্বাস্তুর পরিচয়লিপিতে আগত জনস্রোতের ঢেউ-এর কাল থেকে। ভারত ভাগের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল শিলিগুড়ি। ১৯৬২ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব আক্রমণের ঘটনায় শিলিগুড়ির সামরিক গুরুত্ব তাকে দ্রুত এগিয়ে দিল।

শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল সব স্বাভাবিক হিসেবকে ছাড়িয়ে এক অস্বাভাবিক হারে। ১৯৫১ সালে দার্জিলিং শহর ছিল এই জেলার বৃহত্তম শহর। শিলিগুড়ি শুধু যে দার্জিলিং শহরকে ছাপিয়ে এই জেলার বৃহত্তম শহরে রূপান্তরিত হয়েছে তা নয়, এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের অধিকাংশ শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার থেকে বেশি। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ এই শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ হারে যা মহানগরী কলকাতার জনসংখ্যার হার থেকেও বেশি। ওই সময়ে শহরে নতুন বাড়ি তৈরির বৃদ্ধির হার ছিল ১১ শতাংশ। এর ফলে এখানে গড়ে উঠেছে একের পর এক বস্তি। অথচ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিলিগুড়িতে কোনও বস্তির অস্তিত্ব সরকারি নথিতে ছিল না। শিলিগুড়ি শহরের এই জনবিস্ফোরণের চরিত্রের দিকে এক পলক দৃষ্টি দেওয়া যাক। প্রশ্ন হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে কারা আসছে? কেন আসছে?

শিলিগুড়ি শহরের এই জনবসতিকে এক কথায় বলা যায় মাইগ্রেশন জনবসতি। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে এই শহরের প্রতি ১০০ জনে ৬০ জন এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। বিহার থেকে এসেছে ১৭ জন। মারোয়ারি ৮ শতাংশ। বাকি ১৫ শতাংশের মধ্যে এসেছে দক্ষিণবঙ্গ এবং আসাম থেকে। এখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তো বটেই শহর সংলগ্ন বিহার ও নেপাল থেকে নানা ধরনের লোক ভিড় করছে শিলিগুড়িতে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রতিদিন কয়েক হাজার নিত্যযাত্রী। এরা আসে শহরে নানা জীবিকার সন্ধানে। এরা শিলিগুড়ি থেকে রোজগার করে বটে কিন্তু এই শহরের প্রতি তাদের কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না। সারা দিন কাজের শেষে যে যার জায়গায় ফিরে যায়।

এই নিত্যযাত্রীরা কেন এখানে আসে তার ওপর একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি ক্রমশ এদের হাত থেকে চলে যাওয়ায় সেখানে কৃষিকাজে কাজের সুযোগ থাকছে না। কয়েক দশক আগেও রিক্সার শহর বলে শিলিগুড়িতে স্থানীয় রিক্সাচালক দেখা যেত না। অধিকাংশ রিক্সা চালক ছিল বিহার থেকে আগত মানুষ। এখন এই রিক্সাচালকের সিংহভাগই আশপাশের এলাকা থেকে রাজবংশী। তুলনামূলকভাবে কম হলেও বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে আসা অনুপ্রবেশকারীরাও এই শহরে রিক্সা চালকের বৃত্তিকে বেছে নিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের আশপাশের গ্রামের দারিদ্র যে সেখানকার মানুষদের রুটি রোজগারের খোঁজে এই শহরের নানা বস্তির বাসিন্দা হতে বাধ্য করছে তার উদাহরণ রাজমিস্ত্রির যোগালি কাজে রাজবংশী মহিলাদের ভিড়। অথচ মাত্র কয়েক দশক আগেও রাজবংশী সমাজ ছিল অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। তাদের ঘরের মেয়েরা গৃহস্থালী কাজেই নিযুক্ত থাকত।

আরেক সমীক্ষায় দেখা যায় এই সমস্ত নিত্যযাত্রীদের ৩৫ শতাংশ আসে কাজের সন্ধানে, বাজার করতে আসে ১৫ শতাংশ, শিক্ষায়তনের জন্য আসে ৮ শতাংশ, চিকিৎসার প্রয়োজনে আসে ৬ শতাংশ, ১২ শতাংশ আসে ঘুরতে। বাকিরা আসে নানা সামাজিক প্রয়োজনে।

শিলিগুড়ি শহরের পরিচয় 'ওয়ান ব্রিজি টাউন'। মূল রাস্তা বলতে ছিল হিলকার্ট রোড। সে আজ আর এখানকার অর্থনৈতিক প্রবাহের চাপ বহনে অক্ষম। সেভক রোড ও বর্দ্ধমান রোড ধরে গড়ে উঠেছে নতুন বাণিজ্যিক ক্ষেত্র। শহর ও পাড়ায় যাতায়াতের বাহন এখনও রিক্সা তবে অসংখ্য নেমপ্লেটহীন টোটো তার জায়গা নিতে শুরু করেছে।

এই শহরের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য গড়ে উঠেছে পাইকারি ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। এই পাইকারি ব্যবসা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ভিনপ্রদেশীয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর হাতে। অন্যান্য শহর এমন কি পাশের শহর জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সমাজকল্যাণমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায় তার অভাব এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। এই শহরে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির মতন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এগিয়ে আসতে এদের খুব একটা দেখা যায় না।

শিলিগুড়ির এই বাণিজ্যিক চাকচিক্য নিয়ে কিন্তু ভাববার প্রয়োজন আছে। যে কোনও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার পেছনে শিল্প কাঠামোর ওপর। শিলিগুড়ির নেই কোনও শিল্প কাঠামো। এখানকার অর্থনীতির মূল কাঠামো চা এখন আর শিল্পের চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। এটা নব্য ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের মুনাফাসর্বস্ব ভাবনায় গদি ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে। পর্যটন শিল্প পরিকাঠামোর অভাবে তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না।

শিলিগুড়ির বাণিজ্য সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে। সে সময় ব্রডগেজ লাইন ছিল শিলিগুড়ি পর্যন্ত। আসামে ছিল মিটার গেজ। তাই ব্রডগেজে মালপত্র এখানে আসার পর সেগুলি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে পাঠান হত বলে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান খাদ্যশস্যের পাইকারি কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। আজ আসামে ব্রডগেজ লাইন প্রসারিত হবার পর সেই সমস্ত সামগ্রী যে সরাসরি চলে যাচ্ছে তা বোঝা যায় মহাবীরস্থানের পাইকারি ব্যবসায় দ্রুত ক্ষয় দেখে। আগামী দিনে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে সামগ্রী চলাচলের ব্যবস্থা চালু হলে উত্তর-পূর্ব রাজ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে শিলিগুড়ির এই গুরুত্ব লোপ পেতে বাধ্য। তার প্রভাব পড়বে শিলিগুড়ির অর্থনীতির ওপর। অনেকটা দেশভাগের আগে ব্যস্ত রেল জংশন দোমহনির বর্তমান অবস্থা দেখে শিলিগুড়ির ভবিষ্যত নিয়ে এখনই ভাবা দরকার।

শিলিগুড়ি নগর ও নগরোন্নয়ন

শিলিগুড়ি এককেন্দ্রিক পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতার একচ্ছত্র প্রভুত্ববাদকে এড়িয়ে কতখানি এগোতে পেরেছে সেই আলোচনা আগামীতে করা যেতে পারে। তবে একটা প্রচেষ্টা যে আছে তার প্রতিফলন দেখা গেছে শিলিগুড়ি নিজেই উত্তরবাংলার অঘোষিত নগর বলে পরিচয় লাভ করেছে। কে দিল কারা দিল কীভাবে এল এই

বিশেষণ তার উৎস সন্ধানে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকলেও আলোচ্য প্রতিবেদনে তা সম্ভব নয়।

শিলিগুড়ির রূপান্তর ঘটেছে নগরে। তবে নগরায়ণ ও নগরোন্নয়ন যে সমার্থক নয় সেটা না বুঝতে চাইলে নগর শিলিগুড়ির অবস্থান ও ভবিষ্যত নিয়ে কোনও সঠিক আলোচনা সম্ভব নয়।

নগরের প্রশ্নে ভারতের জনগণনায় বলা হয়েছে এর ন্যূনতম জনবসতি হতে হবে ৫০০০ অথবা প্রতি বর্গমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৪০০। পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনে বলা হয়েছে কম করেও ২০ হাজার মানুষের বসবাস এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৫০ জন মানুষের বসতি।

শিলিগুড়ির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই শহরটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা শহর। যে সমস্ত বিশেষ কারণকে কেন্দ্র করে একটা জনপদ নগরে রূপান্তরিত হয় সে রকম কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা এই শহরটি গড়ে ওঠার পেছনে নেই।

হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই রাজ্যের যে কোনও শহরের তুলনায় বেশি তো বটেই ভারতের অন্যসব শহরাঞ্চলের তুলনায় অনেক দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার এই চাপ বইবার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য এই শহরের পরিকল্পিত পরিকাঠামো রূপায়নের যে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা ছিল তার অভাবে এই শহরটি আপন ভারেই নুব্জ হয়ে পড়তে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বৃদ্ধির (প্রতি হাজারে) একটা তুলনামূলক হিসেব দেওয়া যেতে পারে।

বছর	শিলিগুড়ি	নগরাঞ্চল (পঃব)	নগরাঞ্চল (ভারত)
১৯৩১	১০০	১০০	১০০
১৯৪১	২০৯	১৬৩	১৩২
১৯৫১	৬৫০	২১৭	১৮৭
১৯৬১	১৩০৯	২৯৫	২৩৬
১৯৭১	১৯৫০	৩৭৮	৩২৬
১৯৮১	৩০৮০	৪৯৮	৪৭৭
১৯৯১	৪৫৩৪	৬৪৩	৬৫০

শিলিগুড়ির এই জনবিস্ফোরণ ঘটেছে একেবারে এলোমেলো ভাবে। আধুনিক নগরায়নের জনবসতির যে একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায় তার কোনও উপস্থিতি এখানে নেই। ভাবা হয়নি পরিবহণের জন্য পরিকল্পিত রাস্তার কথা। মানুষের ফুসফুসের মতন একটা শহরের ফুসফুস মুক্ত বায়ুর খোলা জায়গার কথা ভাবা হয় নি। ভাবা হয় নি এই ভূকম্পন প্রবণ এলাকার মাটির বহন ক্ষমতা। চিন্তা করা হয় নি শহরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার জন্য এখানকার ভূমির ঢালের সমীক্ষার কথা।

নগরায়নের অর্থ মানুষের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শহরটাকেই আবর্জনার স্তূপে পরিণত করা নয়। এটি হলে উন্নয়ন আর অবনয়ন একই অর্থ বহন করবে। সেটি হবে মৃত্যুপুরী।

নগর পরিকল্পনার শব্দটি প্রথম এসেছিল ইতালির নগরায়নে ১৮৬৫ সালে। প্রতিটি এলাকায় ভূমি ব্যবহারে মানচিত্র তৈরি করে সেই অনুসারে তার ব্যবহার, হাসপাতাল ও অফিসের জন্য পৃথক অঞ্চল, খোলা আকাশ, মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলো ও উদ্যান পরিবহণ ইত্যাদির জন্য প্রশস্ত পথের যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি নগরোন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। কোনওটাই শিলিগুড়ির জন্য ভাবা হয়নি। শহরের পাশাপাশি গ্রামগুলিকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে নগর বা শহরকেও বাঁচান যায় না। উভয়েই বিনষ্ট হয়। মাটি তথা ভূস্তর শহর ও গ্রামের ভূমি তথা ভৌগোলিক বিভাজন তো মানে না। ভূগর্ভস্থ জলস্তর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তুলে আনলে উভয় ক্ষেত্রেই জলস্তর নেমে যায়। শহরের এই ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে যেভাবে গভীর নলকূপের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে তাতে এই শহরের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বহু ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ আসছে তাদের ট্যাঙ্কে লাল জল উঠে আসছে। এই বৃদ্ধিতে তাই নগরায়ণ হবে কিন্তু নগরোন্নয়ন হবে না।

১৯৬৪ সালে শিলিগুড়ির উন্নয়নের জন্য যখন শিলিগুড়ি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছিল তখন শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার। ১৯৮০ সালে একে সম্প্রসারিত করে গঠিত হয়েছিল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটি। ১৯৮৬ সালে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি অ্যাক্ট-১৯৭৯ ধারায় এই শহরের জন্য যে আউটগোইং ডেভলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি হয়েছিল তা ১৯৯২ সালে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল। ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও এসজেডিএ যুগ্মভাবে একটা নগর পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছিল। এখানে বলা হয়েছিল শহরের বাসস্থান মেটাতে প্রতি বছর ৬১০০টি নতুন বাড়ির প্রয়োজন হবে। কিন্তু কীভাবে কোন এলাকাগুলিকে এই আবাসন নির্মাণের অঞ্চল চিহ্নিত করা হবে তার কোনও রূপরেখা দেওয়া হয়নি। অথচ আধুনিক নগরায়নের নগরোন্নয়নের এটাই প্রাথমিক শর্ত। তা না হলে পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় সেই শহরে ঘটবে আর্বান এনভায়রনমেন্ট ডিজাস্টার।

১৯৬৬ সালে শহর এলাকার আবাসিক অঞ্চল ছিল ৫.৯৬ শতাংশ। ১৯৮৬ সালে হয়েছিল ২৫ শতাংশ। এখন কর্পোরেশন এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশই আবাসিক অঞ্চল। বসতি গড়ে উঠেছে নদীর চর থেকে সর্বত্র। শহরের আবাসিক অঞ্চলের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে চলেছে দ্রুত। প্রতি শহরের এক একটি এলাকার একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে তাকে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যেমন গোলাপি বা

শিলিগুড়ির প্রধান নদী মহানন্দাসহ ফুলেশ্বরী, বালাসন জোড়াপানি আজ প্রায় মৃত। রাষ্ট্রসংঘ জনবসতির ক্ষেত্রে যে রূপরেখা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৭ একর ফাঁকা জমির দরকার। এটাই হয় মানুষের শরীরের ফুসফুসের মতন শহরের ফুসফুস। শিলিগুড়ি শহরের এই ফাঁকা জমির আয়তন প্রতি হাজারে ০.১৪ একরেরও কম।

পিঙ্ক সিটি জয়পুর। আগে যে বাড়ি ছিল তা ভেঙে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে গড়ে উঠছে বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাট। যেখানে থাকত এক অথবা দুটি পরিবার সেখানে জায়গা নিচ্ছে নানা ভাষী পরিবার। পাল্টে যাচ্ছে বসতির চরিত্র সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য। চাহিদা মেটাতে বসছে গভীর নলকূপ। খালি মাটি থাকছে না যার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বজায় রাখে।

শিলিগুড়ির প্রধান নদী মহানন্দাসহ ফুলেশ্বরী, বালাসন জোড়াপানি আজ প্রায় মৃত। রাষ্ট্রসংঘ জনবসতির ক্ষেত্রে যে রূপরেখা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৭ একর ফাঁকা জমির দরকার। এটাই হয় মানুষের শরীরের ফুসফুসের মতন শহরের ফুসফুস। শিলিগুড়ি শহরের এই ফাঁকা জমির আয়তন প্রতি হাজারে ০.১৪ একরেরও কম।

শহরের পরিচয় তার গতি। তার জন্য প্রয়োজন রাস্তা। আন্তর্জাতিক হিসাবে একটা শহরের ১৫ শতাংশ জমি থাকার কথা এই রাস্তার জন্য। এই শহরের মোট এলাকার মাত্র ৫ শতাংশ আছে রাস্তার জন্য। অথচ এখানে নিত্যনতুন যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। যান চলছে শামুকের গতিতে। বাড়ছে বায়ু দূষণ।

বিমান চলাচলের মতন একটা শহরের বায়ু প্রবাহের নিয়ম বা চরিত্র অনুযায়ি শহরের বহুতল বাড়ি নির্মাণের নক্সা অনুমোদন হওয়ার কথা যাতে বায়ু প্রবাহের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তার কোনও ভাবনা নেই এখানে। শহরকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন এর চারিপাশে সবুজ বলয় যাকে বলা হয় গ্রিন বাফার জোন। এই শহরের উপকণ্ঠে বৈকুণ্ঠপুর বনভূমি ক্রমশ গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা হয়ে চলেছে।

শিলিগুড়ির জমির ঢাল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রতি কিলোমিটারে ৩ মিটার। ১৯৯৪ সালে যে নগর পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন পাকা নর্দমা ছিল ১০৭ কিমি। কাঁচা নর্দমা ১৬০ কিমি। কাঁচা নর্দমার কথা বাদ দেওয়া গেল। পাকা নর্দমাগুলি নির্মাণের সময় এই ঢাল তথা শিলিগুড়ির টোপোগ্রাফি ভাবনায় নেওয়া হয় নি। ফলে পাকা নর্দমাগুলিও কিছুদিনের মধ্যে জলপ্রবাহে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই শহরকে নিয়ে ভাবার দরকার। তা না হলে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা বিস্ফোরণে রূপান্তরিত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন খোলা মনে বিস্তারিত আলোচনা।

(চলবে)

প্রবাসী নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন

অহংকার → ঔদ্ধত্য → অসহিষ্ণুতা → অনমনীয়তা → দুর্নীতি → প্রহসন → জনরোষ

কল্যাণ বল্লভ গোস্বামী

আমরা সবাই জানি যে, সমাজে সবার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, ভূমিকা আছে, মর্যাদা আছে। পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকলে সমাজ সুষ্ঠু ভাবে চলে। কিন্তু এই 'পারস্পরিক সম্মান' ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের সমাজের থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। তাইতো সৃষ্টি হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ, বাড়ছে অসন্তোষ, বাড়ছে দুরত্ব।

ভেবে দেখুন এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (তাও আবার মহিলা), একদিন এই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দু গালে থাপ্পড় মারবেন বললেন। আবার সাথে সাথে গণতন্ত্রের জোর দেখুন, হিসেব বহির্ভূত ওই লোকসভা সিটে (যেখানে দাঁড়িয়ে থাপ্পড়ের উল্লেখ হয়েছিল) তৃণমূল গো হারা হেরে গেল। এখানে আসলে তৃণমূল হেরে যাওয়াটা কিন্তু বড় কথা নয়, বাঙালি সংস্কৃতি আর ভদ্রতা শিক্ষা কৃষ্টির পরাজয় হল, সেটা বড় কথা। সেদিন নেত্রীর ব্যবহারে আপামর বাঙালির মাথা হেঁট হয়েছে। যত শীঘ্র এই লজ্জাজনক ঘটনাকে স্বীকার করে মাথা নোয়াবেন, ততই ভালো!

আজকাল নিজ সমালোচনা শুনলে আমদের সকলের কান ফেটে যায়। মুঘল বাদশাদের রক্ত আমাদের শরীরে না থাকলেও, ওদের মহারাজ স্টাইলটা আমরা কিন্তু রপ্ত করে নিয়েছি। তাই অল্পতেই তপ্ত হয়ে যাই। রাজনৈতিক দল এবং নেতারা আজকাল রাজনীতি এবং রাজত্ব দুটোকে গুলিয়ে ফেলছে। তাই কেউ একটু নাড়িয়ে দিলেও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

রাজনীতির স্বার্থে, ভোটের ভাবনায় এখন আমরা নাথুরাম গডসের প্রশংসা করতেও পিছপা হই না। আমি দিল্লীতে থাকি, মনে আছে একটা সময় খুল্লাম খুল্লা ভাবে অনেকে ইন্দিরা গান্ধীর আততায়ীদের ফটোতেও মালা দিতে দ্বিধাবোধ করে নি। আবার এটাও ঠিক, ওই দিনগুলোতে প্রণম্য বাজপেয়ি মুরলিমনোহর মদনলাল খুরানা দের মত নেতাদের হাতে রাশ থাকার কারণে, মাল্যদানকারি লোকেদের তৎক্ষণাৎ ঠাঁই হয়েছে দলের বাইরে। আজ যখন নাথুরাম ধীরে ধীরে রামের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, যখন কোনও কোনও সাংসদ নাথুরামকে গান্ধীজির হত্যার শ্রেয় দেয়, বাজপেয়ি মুরলিমনোহরের সাথে অজান্তেই মোদি অমিত শার মানসিকতার হাজার ক্রোশ দুরত্ব খুঁজে পায় জনগণ। মনের গভীরে জন্মে তিক্ততা, অশ্রদ্ধা!

দিল্লীতে এসে পরিচিত হয়েছি প্রণব বাবু, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সোমনাথ চ্যাটার্জি, মধু দণ্ডবতের মত নেতাদের সাথে। ত্রিশ বছর আগেও বলার মত হাজার জন নেতা ছিলেন। হ্যাঁ, তখনও হয়ত ইতি উতি মুষ্টিমেয় কিছু বদনামি নেতাও ছিল।

আর এখন? ঠক বাছতে গা উজাড়!

ওসব দিনে বাংলায় গর্বের সাথে নাম নেওয়া যেত, রাজনীতিবিদ প্রমোদ দাসগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, গনিখান, জ্যোতি বসু, প্রিয় দাসমুন্সি ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যক্তিদের। যাঁরা দুর্নীতির সাথে কখনও আপস করেন নি। বড় হয়ে সুনীতি চট্টরাজের (সোনা দা) মুখ থেকেই শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকরবাবু তাঁর মন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজকে একটি অত্যন্ত সাধারণ অভিযোগের ভিত্তিতে সরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে, তদন্ত শেষ হলে সুনীতি চট্টরাজের প্রত্যাবর্তন হয়। কিন্তু আজ, নারদা সারদা রোজভ্যালি রেফেল যুদ্ধবিমান... যা খুশি তাই হতে থাকুক। কেউ লজ্জিত নয়, কুণ্ঠিত নয়। কী আসে যায়, আমি তাই আমি তাই গো!!

রাজনীতি ছেড়ে, পেশাদারি ক্ষেত্রেও একটু নজর দেয়া যাক। ৩০ বছর আগে আমরা মাতৃ শহরে আড্ডা মারতে গেলেই শহরের তদানীন্তন ডাক্তারদের ব্যবহার ভদ্রতা সততার প্রশংসা করতাম। সত্যি কথা বলতে মনেই পড়ছে না, ওসব দিনে কারও আমরা নিন্দা করার সুযোগ পেতাম কি না। কিন্তু এখন নিজের শহরে গেলে দু পাঁচজন ডাক্তার বাদে, অন্য সব ডাক্তারের বিরুদ্ধেই জনরোষ দেখতে পাই। হাজার অভিযোগ শুনতে পাই।

মনে প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ করে কেন এই পরিবর্তন?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল নার্সিং হোমে যেতে আমার নিজেরই ভয় লাগে। সুতরাং সাধারণ লোকের অবস্থা অনুমেয়। পাবলিক আউটক্রাই কর্পোরেট হাসপাতালগুলোতে যত বেশি শোনা যায়,

ভেলোর অমৃতা সত্যসাই দেবীশেঠির হাসপাতালে কেন শোনা যায় না?

এটা হচ্ছে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের কিছু উদাহরণ। হাতে গোনা কিছু চিকিৎসা সংস্থা কিন্তু লোভের কারণে নিজেদের ইমেজ খারাপ করেনি। যেটা অন্য বেশিরভাগ কর্পোরেট হাসপাতাল করেছে। তাই সেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারণে জনগণ চড়াও হয়। আসলে, বিশ্বাস দিনে দিনে তলানিতে এসে ঠেকেছে।

একটা প্রবাদ বাক্য আছে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট !!

অগুনতি অপ্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন দেওয়া, দরকার না হলেও গাদা গাদা ডায়াগনস্টিক টেস্ট করানো, চিকিৎসার ভয়ংকর খরচা, এসব সাধারণ লোকেদের মধ্যে খুব একটা ভাল ইম্প্রেশন দেয় না। তবে বলে রাখি, ডাক্তার সমাজ এখনও কিন্তু বেশিরভাগ রাজনীতিবিদদের মত সবাই দুর্নীতির গড্ডালিকা প্রবাহে বয়ে যায়নি। কিন্তু কিছু ডাক্তারের সৃষ্ট অবিশ্বাসের কারণে মার খায় নিরপরাধ ডাক্তারও। সেটাই সবচেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার! এই অবিশ্বাস না গেলে দেশে আগুন জ্বলতে বাধ্য! শুধু সরকারি হাসপাতাল কেন, নার্সিং হোমগুলোতেও কি ভাঙচুর হয় না? আশা করি প্রশাসনকে চোখ বন্ধ করে সব সময় দোষ দেবেন না।

জানেন, খটকা কোথায় লাগে?

ডাক্তাররা ভাল, মন্দ, কসাই, না বাবুমশাই সে তো দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। ডাক্তারদের স্ট্রাইক নিয়েও নিশ্চয় হাজার ডিবেট করা যেতে পারে। কিন্তু গুণ্ডাদের হাতে জুনিয়র ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর ভাবে মার খেল, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসন তাও চরম উদাসীন। ডাক্তাররা নিরাপত্তার দাবি তুললে, সেটা অপ্রয়োজনীয় বা বাতুলতা। রাজ্যে সুশাসন থাকলে কি নিরাপত্তার প্রশ্ন আসত? না ডাক্তারদের ধর্মঘটের প্রশ্ন উঠত? নিজেদের জিজ্ঞেস করুন, দুজন আহত ডাক্তারকে একটি বারের জন্যও দেখতে যাওয়া যেত না? শুধু অহংকার, ক্ষমতার অহংকার। রাজ্যপাট যাবে, কিন্তু মাথা নোয়াব না। ডাক্তারদের আন্দোলনের নিন্দে করে, নগ্নভাবে রাজ্য প্রশাসনের অকর্মণ্যতাকে ডিফেন্ড করার সত্যিই কোনও অর্থ হয় না।

তবে কোন পক্ষেরই জেদাজেদি টা ভাল হয়নি। মনে রাখা দরকার— 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

আমার সহপাঠিনী, নিকট আত্মীয়া, স্বনামধন্য লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদারের ভাষায়,

"নবীন চিকিৎসক পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের ফাটা, তোবড়ানো, বিক্ষত করোটি থেকে উপচে পড়া রক্ত কেবল তাঁর রক্তই নয়, আসলে এ এক বিপুল অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার সূচনা। দীর্ঘ সঞ্চিত ক্ষোভ ও যন্ত্রণার জ্বালামুখির প্রতীক তাঁর ওই ক্ষত নিঃসৃত রক্তস্রোত।

পড়ুয়া রক্তাক্ত অর্ধমৃত চিকিৎসকরা কী চেয়েছিল?

—ওরা চেয়েছিল, সহানুভূতি, খানিকটা আশ্বাস।

সেটুকুও তাঁরা পায়নি। বরং যে ভাষা ও ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের শাসিয়েছেন তাতে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসে মনে হয়েছে, যাকে পরিচালনা বলে না, প্রশাসনিক বলে না, বলে ত্রাসন, বলে ফ্যাসিস্ত, অগণতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য। তা নিন্দনীয়, বর্জনীয় এবং ন্যাক্কারজনক।"

আমিও তিলোত্তমার (রুমনি) সাথে একমত। আজ যে প্রতিবাদের বিস্ফোরণে চিকিৎসকরা একাত্ম,

সমাজের অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠান থেকেই তা প্রকট হতে পারে। বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। সেটা অতি সত্বর বুঝে নিলে রাজ্যের উপকার, সমাজের উপকার।

স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য ফেরাতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামফ্রন্ট সরকারের থেকেও বেশি কাজ করেছেন। কিন্তু রাজ্যে আরও অনেক হাসপাতাল চাই। সুচিকিৎসা চাই। ভাল পরিকাঠামো চাই। ডাক্তার চাই। না হলে রোগীর ভিড় সামলানো মুস্কিল হবে আর জনরোষ অসন্তোষ বাড়বে। এদেশে ভাল লোকের যেমন অভাব নেই, তেমনি গুন্ডারও অভাব নেই। বিশেষ করে প্রশাসন এবং সরকার অন্ধ হলে যা হয় সেটাই হচ্ছে। সেটাই হতে থাকবে। এর পর কোনও মা বাবা চাইবে না, তার আদরের সন্তান চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়ুক।

যখন জনরোষ তুঙ্গে, যখন লোক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যখন রাজ্যে সংগঠনহীন বিজেপি জনগণের আশীর্বাদের প্লাবনে ভাসছে, সে সময় অহঙ্কার ত্যাগ করে, আগেই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ডাক্তার ধর্মঘটের ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেই ভাল হত। এখন, যে যতই নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াক, যা বুঝি, ডাক্তার সংক্রান্ত এ ঘটনায় তৃণমূলের বেশ অনেকটাই ক্ষতি হল। সাধারণ অরাজনৈতিক লোকেরা অহঙ্কার জেদ পাগলামির এই ঘটনাকে মনে হয় না হজম করতে পারবে।

মনে রাখা দরকার, ডাক্তারদের যদি (?) দোষ থেকেও থাকে, ওরা তো আর দরজায় দরজায় ভোট চাইতে যাবে না! যারা ভোট চাইতে যাবে, তারা আগে ভাগে সজাগ হলে তাদেরই উপকার হত।

বিপদে পড়ে ওই ধোপার ঘাটেই তো জল খেলে বাপু, তবে আগে সেটা করলে কি ভাল হত না?

লঙ্কেশ্বর রাবণ তার দর্পের কারণে ধ্বংস হয়েছিলেন। অহংকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পতন নিশ্চিত। রাবণের অতিরিক্ত অহংকারের জন্য লঙ্কার মতো শক্তিশালী রাজ্যেরও পতন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপনের আগে মুখ্যমন্ত্রী অহংকার ছেড়ে আহত যুবক চিকিৎসকদের দেখতে গেলে, বিদ্যাসাগর মশাই খুশি হতেন। রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ত।

অন্যদিকে, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত জেগে উঠেছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলো। এখানে সব ঘটনার আমরাই বিচার করি, আমরাই শাস্তি প্রদান করি। কোনও ঘটনার তদন্ত করার প্রয়োজন নেই, আর আদালত বা বিচারব্যবস্থারও দরকার নেই। ফট করে কুৎসা রটিয়ে দিলেই হল, কেউ সত্যিই দোষ না করে থাকলেও পরিবারে পাড়ায় বা সমাজে সে ব্যক্তির যে কি বীভৎস অবস্থা হবে, সেটাও আমাদের বোধগম্য হয় না। অথচ, আমরা নাকি মানবাধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতনশীল। ভগবান জানে এর স্টপ কোথায়!!

শিক্ষার ক্ষেত্রে সারা ভারতে লুট চলছে। অথচ কেউ চাকুরি তৈরি করতে অক্ষম। ভাল সরকারি সংস্থানে চান্স পেতে হলে খুব ভাল স্টুডেন্ট হতে হবে। প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে গেলে নিদেন পক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজমেন্ট কোর্স ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তারপর কোর্স কমপ্লিট করেও চাকুরী নেই। নেতারা বিদেশ ভ্রমণ বা বাক যুদ্ধে ব্যস্ত। অথচ চাকুরি সৃষ্টিতে দেশ গত ৪৫ বছরের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়।

বাংলায় ২০০৮-১১ তে, আর কেন্দ্রে ২০১২-১৪ তে যখন লোক খ্যাপানোর রাজনীতি চলছিল, আমি জাতীয় পত্রিকাগুলোতে সাহসের সাথে দৃঢ়তা নিয়ে তার বিরুদ্ধে লিখেছি। বিরোধীদের সুকাজের কৃতিত্ব চেপে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিঙ্গুর, ২জি ৩জি কে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা হচ্ছিল, সে সময়ে।

বহু বছর অতিক্রান্ত, দিল্লীতে কংগ্রেস বা পশ্চিমবঙ্গে বামেদের কোনও নেতা কি জেলে গেছে?

লোক খ্যাপানো যেকোনও দিন বুমেরাং হতে পারে। যেটা এখন বাংলায় দেখছি। হয়ত ২০২৪ এ সারা দেশে দেখব। কে জানে বিজেপিতে অমিত শাহ হঠাৎ করে সবাইকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বিজেপিকে ভূপতিত করার চেষ্টা করে কিনা! রাজনীতিতে অরুণ নেহরুরা আসে যায়! শুধু বিশ্বাস হারায় সাধারণ জনগণ।

ধর্মের তোষণ শোষণ আগেও ছিল, এদেশে জাত বিভেদও আগে ছিল। কিন্তু এতটা ভয়ঙ্কর মাত্রায় ছিল কি? রাজনীতির কচকচানিতে সর্বত্র আজ ধর্মীয় বিভেদ।

কংগ্রেসকে আজ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়, বামেরা আপাতত বনবাসে। হয়ত একদিন গগনমুখী বিজেপিকেও মাটিতে নেমে আসতে হবে। পরিবর্তন প্রত্যাবর্তন চলতেই থাকবে, কিন্তু সাধারণ জনমানসে ঘনীভূত হচ্ছে রাজনীতি আর নেতাদের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা। আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে আমাদের যদি বিশ্বাসটাই না থাকে, দেশ আর সমাজ এগোবে কী করে?

কেন এই ধর্মীয় অসহনীয়তা? অসহিষ্ণুতা? আমার একটি কবিতার অংশ শোনাই।

আমি ভাগ্যবান
ঘরে আছে গীতা বাইবেল কোরান
আমি এদের লড়তে দেখিনি
যে উন্মাদ লড়ে,
তাকে কখনো ধর্মগ্রন্থ পড়তে দেখিনি।

তাহলে, শুধুই কি রাজনৈতিক স্বার্থ! যার জন্য বহু কষ্ট অর্জিত সম্প্রীতির জলাঞ্জলি দেওয়া যায়! লজ্জাজনক হলেও, সেটাই সত্যি।

"মানুষদের অবিশ্বাস অসন্তোষ ক্রোধ কি এমনি এমনি জন্মে ?"

পশ্চিমবঙ্গে একদিকে চলছে তিন দশক আগের বিহারের মত জঙ্গল রাজ। গ্রাম ব্লক মহকুমা থেকে শুরু করে জেলা স্তরে শুধু খাই খাই আর ক্ষমতার অপব্যবহার। জনগণ যখন ভয়ঙ্করভাবে তেতে আছে, সেই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের ব্যবহার সত্যিই চিন্তায় ফেলে। তবে যেমন বিশ্বাস করি না যে সব বিজেপি নেতা ধোয়া তুলসি পাতা, আর এটাও বিশ্বাস করি না যে সব তৃণমূলের নেতাই চোর। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তৃণমূলে আছে। আজ পর্যন্ত ওরা এক পয়সার উপার্জন করেনি, বা করতে পারেনি। ব্যতিক্রমটাও আছে। সে যাই হোক, বিপাকে পড়লে নেতারা কেমন যেন হঠাৎ করে মাটিতে নেমে আসেন। বাংলা ভাষায় বলে, ঠ্যালার নাম বাবাজি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপাকে পড়ে আজ সাধারণ জনগণের সাথেও কথা বলতে প্রস্তুত।

কিন্তু মনে আছে? 'দিদিকে বলতেই' বহু বছর আগে কালীঘাটে গিয়েছিলেন ৩৪ বছর বয়সি হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার তৃণমূল কর্মী প্রসূন দত্ত। কিন্তু বহুদিন ধর্না দিয়েও দিদির সাথে কথা হয়ে উঠতে পারেনি। পরে কালীঘাটেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ধর্নারত প্রসূন দত্ত আত্মহত্যা করে। নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য হল, হারানো জনসমর্থন ফিরে পাওয়া কিন্তু ওনার সাংবাদিক বৈঠকে কোনও অপ্রিয় প্রশ্ন করতে সাংবাদিকরাও সঙ্কোচে ভোগেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি অভিযোগ ক্ষোভের কথা জানাতে যাবে সাধারণ মানুষ! রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার! নয় কি?

গত আট বছর ধরে সেই 'দিদিকে বলোর' অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। শিলাদিত্য চৌধুরি থেকে তানিয়া ভরদ্বাজ। বাদ যাননি তৃণমূলের অনেক বড়, মেজ নেতাও। বলার জন্যই শিলাদিত্য চৌধুরিকে জেল খাটতে হয়েছিল, তানিয়া ভরদ্বাজকে হুমকি শুনতে হয়েছিল। তাঁর শাসনে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে, হাজার হাজার বিরোধী কর্মী, সমর্থককে ঘরছাড়া হতে হয়েছে। রক্তাক্ত হতে হয়েছে খেতমজুরথেকে কৃষক, কাজ হারানো পরিবহণ শ্রমিক থেকে সরকারি কর্মচারী, ছাত্র-যুবদেরও।

মোদ্দা কথায়, যখন মাথার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হয়, জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, বিশ্বাস কিন্তু আর ফিরে আসে না। ভোটের বাক্সে বিপ্লব হয়। শত বর্ষীয় কংগ্রেসকে আজ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়, বামেরা আপাতত বনবাসে। হয়ত একদিন গগনমুখী বিজেপিকেও মাটিতে নেমে আসতে হবে। পরিবর্তন প্রত্যাবর্তন চলতেই থাকবে, কিন্তু সাধারণ জনমানসে ঘনীভূ ত হচ্ছে রাজনীতি আর নেতাদের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা। আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে আমাদের যদি বিশ্বাসটাই না থাকে, তাহলে দেশ আর সমাজ এগোবে কী করে?

পরিশেষে বলি, আজ সারা ভারতে যদি দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা হঠাৎ করে গণধোলাই খেতে শুরু করে, আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হব না। যার সাথে কথা বলি সেই তেতে আছে। ছোট ছোট নেতাদেরও বড় বড় বাড়ি, গাদা খানেক ফ্ল্যাট, দোকান, গাড়ি। অথচ বেশির ভাগ নেতার চাকুরি নেই, ব্যবসা নেই, আয়ের কোনও উৎস নেই।

সাধারণ পাবলিক কিন্তু ঘাস খায় না!!

এই নিরিখে পুরনো দিনের বাংলা অন্য রাজ্যের থেকে ভাল অবস্থায় থাকলেও গত ৮ বছরে ভয়ংকর অধঃপতন হয়েছে। রাজ্যে বেড়েছে অবিশ্বাস। সাধারণ লোকের চোখে মুখে আজ আগুনের আভাস। ক্ষমতাসীন দল, হয় মেনে নিন, না হলে নেমে যাবেন।

প্রতিটা ক্ষেত্রে, অহংকার ঔদ্ধত্য অসহিষ্ণুতা অনমনিয়তা দুর্নীতি প্রহসন, মানুষের মনে তৈরি করেছে "চরম অবিশ্বাস"। এর পরিণাম অনুমেয়.....।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কাশ্মীর কি গুবলেট করে দিল গোর্খাল্যান্ডের দাবি?

জয়ন্ত গুহ

৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরে মোদির সার্জিক্যাল স্ট্রাইক— 'এক দেশ এক আইন'-এ অন্তর্ভুক্ত জম্মু এবং কাশ্মীর এখন ভারত রাষ্ট্রের দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। আর লাদাখ, যারা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি নিয়ে কাশ্মীর রাজ্য থেকে বাইরে থাকতে চাইছিল, সেই লাদাখও পেল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ প্রসঙ্গে লোকসভা যখন সরগরম ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ঘুমিয়ে পড়া একটি ইস্যু আবারও উঠে আসে রাজ্য রাজনীতিতে —'গোর্খাল্যান্ড'। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতেই উৎসাহের আঁচ দার্জিলিং-এর পাহাড়ে। বিজেপির মিত্রপক্ষ গোর্খাল্যান্ডপন্থীদের মরীয়া পোস্টার পাহাড়জুড়ে। পৃথক রাজ্য যদি নাও হয় এখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়ে, দার্জিলিং-কালিম্পং-ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা চায়। জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তকমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে যেসব পোস্টার পড়ে দার্জিলিংয়ে তেমনই একটি পোস্টারে লেখা ছিল "লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি এবং তাঁর মিত্রপক্ষ দার্জিলিংয়ে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান দেওয়ার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা আসলে ঠিক কী এবার সে কথা জানানোর সময় এসেছে। যদি লাদাখের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উন্নীত করা যায় তাহলে দার্জিলিংকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেন করা হবে না?"

—সাধারণত গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আগে আমরা যে 'মাত্রাতিরিক্ত বিপ্লবী' আন্দোলনের ধরন দেখেছি এক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয়নি। হুমকি এবং আগুনের পরিবর্তে নজরে এসেছে একটি নিয়ন্ত্রিত কিন্তু জোরালো ভাবে রাজনৈতিক দাবি পেশ করার স্টাইল। এটি খুবই স্বাভাবিক, কেননা লোকসভা নির্বাচনে, চা বাগানে ন্যূনতম মজুরি এবং গোর্খাল্যান্ড, এদুটিই ছিল বিজেপির দার্জিলিং সাংসদ রাজু সিং বিস্ত-এর প্রধান প্রতিশ্রুতি। '২০২৪ সালের আগে পাহাড় সমস্যার সমাধান' অবশ্যই বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় ছিল।

"লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি এবং তাঁর মিত্রপক্ষ দার্জিলিংয়ে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান দেওয়ার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা আসলে ঠিক কী এবার সে কথা জানানোর সময় এসেছে। যদি লাদাখের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উন্নীত করা যায় তাহলে দার্জিলিংকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেন করা হবে না?"

৫ আগস্ট কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলকে হাতিয়ার করে 'গোর্খাল্যান্ডের' দাবিকে আবার উস্কে দিয়েছেন খোদ বিজেপি সাংসদ রাজু সিং বিস্ত। যদিও বিতর্কের সূত্রপাত তারও আগে ১২ জুলাই। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে রাজু বিস্ত দাবি করেছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য দিল্লি পুলিসের যে বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়েছে তাতে যেন জায়গা দেওয়া হয় 'গোর্খাল্যান্ড' ও লাদাখের যুবকদের। চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে ২৩ জুলাই পালটা চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাতেও রয়েছে 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দটির উল্লেখ। এতেই দানা বাঁধে বিতর্ক। বিরোধীদের প্রশ্ন, তবে কি 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে বিজেপি? যদিও অবান্তর সেই প্রশ্ন। রাজনৈতিক ভাবে 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দটিকে স্বীকৃতি না দিলে সেটাতো তাঁদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাতেই থাকত না।

তবে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে 'গোর্খাল্যান্ড' ইস্যুতে বিজেপির সঙ্গে একই সুরে কথা বলছেন রোশন গিরি-বিমল গুরুং, জিএনএলএফ নেতা এনভি ছেত্রী এবং তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অনিত থাপা-বিনয় তামাং। বিজেপির সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে', একসুরে সবার দাবি, গোর্খাল্যান্ডকে বিধানসভা-সমেত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিক কেন্দ্র সরকার। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আগামীদিনের আন্দোলনে, একসময়ের সতীর্থ বিনয়ের সঙ্গে কি হাত মেলাবেন বিমলপন্থীরা? ঘটনাক্রম বলছে, বিনয় ও বিমলপন্থী মোর্চার মধ্যে নতুন করে সমঝোতা অসম্ভব নয়। চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ইতিমধ্যেই দুই মোর্চার চা শ্রমিক সংগঠন এক মঞ্চে এসে আন্দোলন শুরু করেছে। হাল ধরতে মাঠে নেমেছেন সমতলের তৃণমূল নেতা অরুপ বিশ্বাস, কিন্তু সে হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা দূরঅস্ত, বলছেন উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহল। লোকসভা নির্বাচনে পরিষ্কার, গোর্খারা তৃণমূলকে দার্জিলিং থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। গোর্খারা আর একবার প্রমাণ করেছে যে তাঁরা 'সায়ানু তারা বিসালু' অর্থাৎ নম্র কিন্তু মারাত্মক।

দ্রুকপা, ভুটিয়া, রাজবংশী, রাভা, মেচ, বাঙালি, লেপচা, শেরপা, নেপালি ভাষাভাষীদের নিয়ে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স, ভারত রাষ্ট্রের এক বর্ণময় এবং জটিল কসমোপলিটান অঞ্চল। ইতিহাস, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সংবেদনশীল না হলে এ অঞ্চলের শাসক হওয়া যায় না। এ অঞ্চলের মনভোলানো অত সোজা নয়। প্রথমত উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে একটা সোজা প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও, কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল জমানায়, উত্তরবঙ্গ থেকে এরাজ্যে কখনও কেউ মুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী হন নি। কেন? ৪২টি লোকসভা আসনের মাত্র ৭টি ফারাক্কার ওপারে বলে কি উত্তরবঙ্গ জাতে উঠতে পারে না! নাকি দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা কেন্দ্রিক অদৃশ্য বহমান এক বর্ণবাদের স্রোত, আসলে চাপিয়ে দিতে চায় 'শান্তি ও উন্নয়নের' এক অরুপকান্তি মডেল? সে মডেল যে কতখানি 'অ-রাবীন্দ্রিক' ও অবাঞ্ছনীয় তার প্রমাণ হাতেনাতে মিলেছে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে। অবস্থা এতটাই করুণ যে উত্তরবঙ্গ এবং পাহাড়ে দিদি তারপর যেতেই পারলেন না। পরিবর্তে পাঠাতে হল দিদির 'দিদিকে বলো' প্রচার অভিযান। এবং যে প্রচার অভিযান তৈরি করতে, বাংলার বাইরে থেকে ভাড়া করতে হয়েছে একজনকে। তাঁর সেই রাজরোষ, হাঁকডাক কোথায় মিলিয়ে গেছে। তিনি সম্ভবত জানেন যে তাঁকে ক্ষমতা থেকে চলে যেতেই হবে। উত্তরবঙ্গ যাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে চলে যেতে হয়। ফারাক্কার ওপারের মানচিত্র গেরুয়া করে

দিয়ে মমতার ললাটলিখন নিশ্চিত করে দিয়েছে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স, যার শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে পাহাড়ে। মমতার ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে।

২০১৭ সালে, দেশের সমস্ত ইশকুলে হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক বিষয় করার সংসদীয় কমিটির প্রস্তাব পেশ হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই, অতি সচেতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা ঘোষণা, "রাজ্যের সমস্ত ইশকুলে বাংলা পঠনপাঠন আবশ্যিক হবে"। যদিও ২০১৮ সালে ইসলামপুরে-ইশকুলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায় বলে অভিযোগ, দুই ছাত্রের। ঘটনাক্রম বলছে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিছক মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে যখনি পশ্চিমবঙ্গে কোনও হঠকারি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গেছেন, সাফল্যের পরিবর্তে তিনি আরও মাটি হারিয়েছেন। ২০১৭র "সব ইশকুলে বাংলা পঠনপাঠন আবশ্যিক হবে" এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরপরই নেপালি ভাষা অধ্যুষিত দার্জিলিং-এ তীব্রতর হয় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য জনজাতির বাসভূমি ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলেও। রাজনৈতিক চালে আবারও ভুল করেছেন বুঝতে পেরে, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন মমতা। পাহাড়ে "বাংলা ভাষা বাধ্যতামুলক নয়" বলে ঘোষণা করেন কিন্তু ততক্ষণে পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে। এমনকি জোটসঙ্গী জিএনএলএফ-ও পাহাড়ে বাংলাভাষা চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে প্রশ্ন তোলে— "... আপনি যদি মনে করেন মানুষ কী 'খাবে' সেটা তাঁর মৌলিক অধিকার এবং তা নিয়ে কারুর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তাহলে ইশকুলে একজন ছাত্রছাত্রী তৃতীয় ভাষা হিসেবে কী পড়বে সেটা আপনি জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছেন কেন? সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে "খাবার 'যার যার' পছন্দ"-র ধারণা জোরালোভাবে সমর্থন করে আপনি একটি বিশেষ অংশের মানুষকে খুশি করছেন অথচ জোর করে কোনও আলোচনা ছাড়াই অগণতান্ত্রিকভাবে বাংলাকে চাপিয়ে দিতে চাইছেন আবশ্যিক তৃতীয় ভাষা হিসাবে..."।

দূরদৃষ্টিহীন হঠকারি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যাঁরা বিষ্ণুর বলয়ের মত থাকেন সেসময় তাঁরা নিশ্চয়ই কেউ মনে করিয়ে দেন নি, বহুদিন আগে শুধুমাত্র ভাষার ওপর আক্রমণ করেছিল বলে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল মুজিবরের 'জয় বাংলা'। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। নিছক মোদী বিরোধিতায় ভাষা নিয়ে অহেতুক খেলতে গিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গের পাহাড়-ডুয়ার্স-তরাই-এর নেপালি এবং অন্যান্য জনজাতির জাতিসত্তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের আয়নায় উত্তরবঙ্গকে দেখতে গিয়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে উত্তরবঙ্গ মানে শুধু বাংলা ভাষা নয়। প্রত্যাশিত উন্নয়ন না হলেও মানুষ সহ্য করতে পারে। কিন্তু জোর করে কোনও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে সেখানে গণরোষ তৈরি হতে পারে। আর সেই সঙ্কট শত উন্নয়ন সত্ত্বেও সামলে ওঠা মুশকিল। আসলে ২০১৭ সালে প্রাথমিকভাবে পাহাড় উত্তপ্ত হয়েছিল তাঁদের ভাষা নিয়ে আন্দোলনে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিকভাবে দিশাহীন অপরিণামদর্শিতার জন্য ঘুমন্ত দৈত্য 'গোর্খাল্যান্ড' আবার জ্বলে ওঠে লেলিহান শিখায়।

আমি নিশ্চিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দমননীতি না চালিয়ে, হাতজোড় করে পাহাড়ের মানুষের সামনে দাঁড়াতেন তিনি অবশ্যই হৃদয় জিতে নিতেন পাহাড়ের। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। কেন না হিমালয়ের থেকেও বড় এক খাঁচায় তিনি নিজেই নিজেকে বন্দি করে ফেলেছেন এবং বাইরে বেরিয়ে আসার রাস্তা সম্ভত তাঁর জানা নেই।

গোর্খাল্যান্ড? নাকি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান?

দীর্ঘদিন ধরে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি করে আসছেন বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। প্রয়াত সুবাস ঘিসিংয়েরও (জিএনএলএফ) একই দাবি ছিল। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিংয়ের ভোটে মূল ইস্যু ছিল গোর্খাল্যান্ড। বিমল গুরুংদের সেবার সমর্থন জানিয়েছিল বিজেপিও। যদিও দার্জিলিং নিয়ে বিজেপি-র বর্তমান স্লোগান 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, দার্জিলিং পাহাড়ে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এর।

২০১৯ জুন: রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন মুকুল রায় এবং দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু সিং বিস্ত। সেদিন মুকুল রায় বলেছিলেন, "দার্জিলিংয়ে বিজেপি জেতার পর থেকেই রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে... এখনই রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমরা দার্জিলিংয়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চাই"।

২০১৯ আগস্ট: অমিত শাহ এবং রাজু সিং বিস্ত-এর চিঠির আদানপ্রদানে 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দের উল্লেখ। যদিও জিটিএ-র কথা উল্লেখ করে পরবর্তী সময়ে দার্জিলিং সাংসদ জানান, 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দের উল্লেখ তৃণমূল তো অনেক আগেই করেছে। সুতরাং এর মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই।

২০১৯ আগস্ট: বিতর্ক উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জলপাইগুড়িতে এক কর্মী সভার শেষে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, "আমরা গোর্খা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন চাই, ওদের দাবি দাওয়ার প্রতি সমবেদনা রয়েছে কিন্তু ওদের আলাদা রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিইনি। পাহাড়ের উন্নয়নে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন। ...কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা দার্জিলিং লোকসভা আসনে জয় পেয়েছি। বিজেপি সেখানে উন্নয়ন করতে চায়।"

যদিও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (বিমলপন্থী)-র সাধারণ সচিব রোশন গিরির দাবি, "অনেক বছর ধরে আমরা পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি করে আসছি। বিজেপি আমাদের 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। আমরা মনে করি কেন্দ্র আমাদের জন্য আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করুক"।

গোর্খা জনজাতির সর্বভারতীয় সংগঠন ভারতীয় গোর্খা পরিসঙ্ঘের সভাপতি মুনিশ তামাং-ও কাশ্মীর-জম্মু এবং লাদাখ-এর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, "স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, দীর্ঘদিনের দাবি গোর্খাল্যান্ড নিয়েও রাজনৈতিক সমাধান করুক কেন্দ্রীয় সরকার"।

সুতরাং শব্দের মায়াজাল ভেঙ্গে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করি তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 'পৃথক রাজ্য' গোর্খাল্যান্ড থেকে সরে এসে বিজেপির 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-র সঙ্গে এক লাইনে এখন গোর্খাল্যান্ডপন্থীরা। তাতে সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না। ২০২১ নির্বাচনে তৃণমূল 'বঙ্গভঙ্গ'-এর ইস্যু তৈরি করতে পারবে না কিন্তু বিজেপি পলিটিক্যাল মাইলেজ নেবে জিটিএ ভেঙ্গে দিয়ে দার্জিলিং-এ ১৮ বছর বাদে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি তুলে। সুভাষ ঘিসিং-এর আপত্তিতে ২০০০ সালের পর থেকে দার্জিলিং-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন আর হয়নি। ঘিসিং-এর দাবি ছিল, ডিজিএইচসি-র ক্ষমতা খর্ব করছে পঞ্চায়েত।

ইতিমধ্যেই দার্জিলিং-এর বিজেপি সাংসদ দাবি করেছেন, জিটিএ অসাংবিধানিক এবং বেআইনি। যত শীঘ্র সম্ভব জিটিএ ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। জিটিএ-র অস্তিত্ব থাকলে পাহাড়ের 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' সম্ভব নয়। আর সেই সমাধানের পথে দার্জিলিং-এ 'ত্রিস্তরীয়' পঞ্চায়েত নির্বাচন করানোর পথে দ্রুত এগোচ্ছে বিজেপি। আর সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করার সম্ভাবনাও রয়েছে। কেননা গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র দার্জিলিঙেই দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (১৯৯২ থেকে)।

বাংলার পাহাড় নিয়ে স্থায়ী সমাধান হোক, পাহাড়ে হিংসা রক্ত বন্ধ হোক, সমতল কাতারে কাতারে আসুক পাহাড়ে বেড়াতে, পাহাড় বা সমতলের সব মানুষই তা চায়। কিন্তু সবশেষে শুধু একটাই আক্ষেপ থেকে যায়। দার্জিলিং বা গোর্খাল্যান্ডের জন্য ঘোষিত 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এর সোনার সকাল দেখে যেতে পারলেন না, শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগের নেতা মদন তামাং। কেন খুন হতে হয়েছিল তাঁকে? তিনিও তো পাহাড়ের উন্নয়ন চেয়েছিলেন। সুভাষ ঘিসিং-এর ষষ্ঠ তফশিলের বিরোধিতা করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার উত্থান। মদন তামাংও তো বিরোধিতা করেছিলেন ঘিসিং-এর দাবি। তাহলে? অকালে কেন চলে যেতে হয়েছিল মদন তামাং-কে?

তবে আশা করি, আগামীদিনে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এ, বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীদের মধ্যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে রাজনৈতিক 'লক্ষ্য' ও কর্মসূচি। নেতৃত্ব নিয়ে যে 'দ্বন্দ্ব' এতদিন আমরা পাহাড়ে দেখে এসেছি তা নিয়ে পাহাড়ি সাধারণ মানুষই বীতশ্রদ্ধ। অতএব তা কখনই কাম্য নয়।

ব্রিটিশ আমলের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট বদলাচ্ছে
নতুন আইনে কি সত্যিই চা শ্রমিক-মালিক সংঘাত মিটবে?

গৌতম চক্রবর্তী

উৎপাদন এবং গুণগত মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য তো রয়েছেই। সামঞ্জস্য নেই মজুরি কাঠামোতেও। রাজ্যভিত্তিক চা বাগানের এই তফাৎ ঘোচাতে এবার তৎপর হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সরকার। বেতন এবং মজুরির ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের জন্য রাজ্যগুলিকে প্রস্তাব দেওয়া নয়, কেন্দ্র এবার সরাসরি বাতিল করে দিতে চলেছে ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট। পরিবর্তে সংসদের আগামী অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদির সরকার আনতে চলেছে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি (ও এইচ এস) বিল। চা উৎপাদনকারী প্রতিটি রাজ্যকে একসূত্রে বাঁধার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী চা বলয় অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে প্রচারে গিয়ে শ্রমিক সমস্যায় জোর দিয়েছিলেন। মূলত এই রাজ্যে এসে শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর চা বাগানের সমস্যার সমাধানে তিনি যে পদক্ষেপ করবেন সেই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবর্তে ও এইচ এস বিল আনতে চলেছে যা সংসদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হবে। ইতিমধ্যে ওই বিলের খসড়া তৈরি হয়ে গেছে।

খসড়া অনুসারে প্রত্যেকটি রাজ্যের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন-এর মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য রাখা হয় নি। এতদিন শ্রমিকদের রেশন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করত চা বাগান কর্তৃপক্ষ। মূলত সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব থাকত বাগান কর্তৃপক্ষের ওপর। এই রক্ষাকবচকে সামনে রেখে ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ গড়িমসি করত বলে অভিযোগ। কিন্তু বর্তমান সময়ে রেশন, চিকিৎসা এবং পাশাপাশি চা শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে সরকার। তাই মজুরির অন্তত ৮৫ শতাংশ যাতে শ্রমিকদের হাতে যায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে খসড়ায়। চা বাগানের বেতনভুক্ত কর্মীদের বেতনের ক্ষেত্রেও রাজ্যভিত্তিক সামঞ্জস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারী কল্যাণে মালিকপক্ষকে কী কী করতে হবে, রাজ্যের ভূমিকা কী হবে, চা শিল্পের উন্নতিতে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী পদক্ষেপ নেবে এবং কী ভাবে সাহায্য করবে এই সবকিছুর উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সংসদের আগামী অধিবেশনে এই বিল পেশ করতে চলেছে তা স্বীকার করে নিয়েছে টি বোর্ডের সদস্য তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, এতদিন যে আইন ছিল তা কার্যত ব্রিটিশ আমলের, যার সঙ্গে বর্তমান সময়ের কোনও মিল নেই। তাই নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যে বিল আনা হচ্ছে তা আইনসভায় পাশ হলে এর ফলে শ্রমিক স্বার্থ যেমন রক্ষিত হবে, তেমনি মালিকদেরও ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে না।

মজুরি এবং বোনাসের প্রশ্নে শ্রমিক মালিক বিরোধ কি কমবে?

চা শিল্পে প্রত্যেক বছর ঠিক পুজোর আগে মজুরি এবং বোনাসের প্রশ্নে শ্রমিক মালিক বিরোধ নিত্য ঘটনা। শ্রমিকদের দাবি ন্যূনতম মজুরি, অন্যদিকে মালিকদের বক্তব্য চা শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যতটা, ততটা বাজার দর পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকেরা ন্যায্য মজুরি নিয়ে অযথা ঢিলেমি করছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। সরকারের ভূমিকাও শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে তারা অভিযোগ করে। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হতে দেখে উদ্বেগ ছড়িয়েছে শ্রমিক মহলে। আসামে এবার পূজা বোনাসের পরিমাণ কমছে, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সেখানকার চা মালিকরা। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে বোনাস আইনের সর্বনিম্ন যে ৮.৩৩ শতাংশ হারের কথা বলা হয়েছে তার বেশি দেওয়া সম্ভব নয় বলেও ঘোষণা করেছেন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও চা মালিকদের সংগঠনগুলি পূজা বোনাস নিয়ে বৈঠকের আগে সেই বিপন্নতারই ধুয়ো তুলে গতবারের হারে এবার বোনাস দেওয়া সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছে।

সত্যিই কি চা শিল্পে উৎপাদন ব্যয় মালিকদের কাছে বোঝা?

বোনাস ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে ব্যাঙডুবিতে ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের তরাই শাখার অফিসে বৈঠকে বসেছিলেন চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর সূত্র মারফৎ জানা গেছে বহু বাগানই ক্ষতিতে চলছে। উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে অথচ তৈরি চায়ের দাম সেই একই জায়গায় স্থির। অসমের পরিস্থিতি থেকে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আলাদা কিছু নয়। তাই গতবারের মত বোনাস দেওয়ার ক্ষমতা বাগানগুলির নেই। গুডরিকের শীর্ষ কর্তা অতুল আসানা বলেছেন, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিও ভাল নয়। তবে এখনও বোনাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয় নি। সেখানে সবকিছু তুলে ধরা হবে। চা মালিকদের একটি সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার রাম অবতার শর্মা বলেন, চা শিল্প যে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বড়দের সঙ্গে ক্ষুদ্র বাগানগুলিও বলছে তাদের শ্রমিকদের গতবারের মত বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, টি বোর্ড প্রতি মাসে কাঁচা পাতার ন্যূনতম বেঞ্চমার্ক দাম ঘোষণা করে দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে কিন্তু তা মেলে না। যেখানে টি বোর্ড নির্ধারিত দাম পাওয়া উচিত সেখানে মিলছে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা। ফলে ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর। গতবারের মত বোনাস দেওয়ার সাধ্য নেই। প্রস্তাবিত

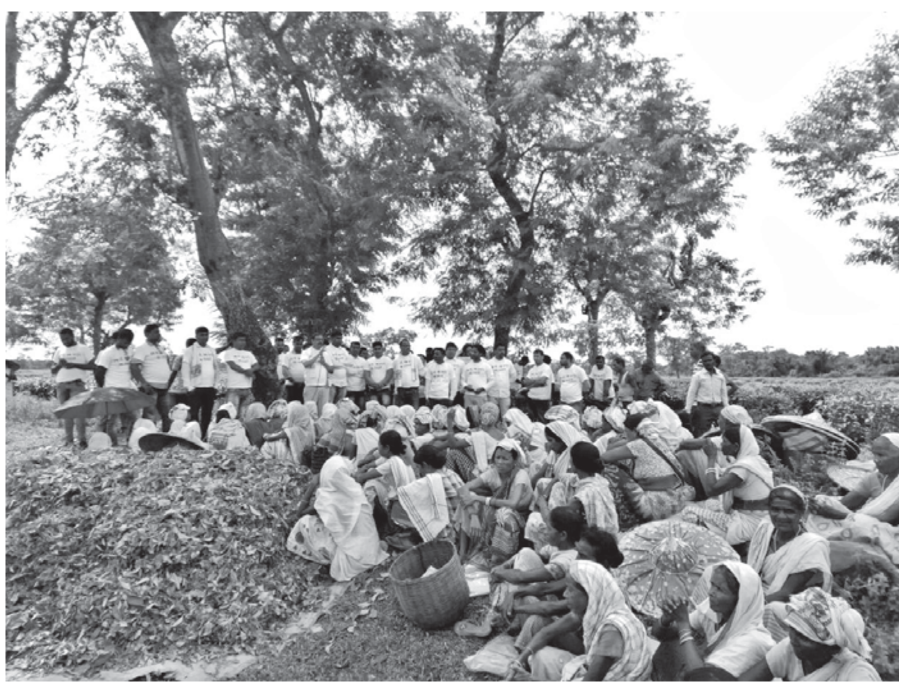

অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি (ও এইচ এস) বিলের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে মালিকদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার তরাই শাখার সচিব সুমিত ঘোষ বলেন, বাস্তব পরিস্থিতিতে নতুন আইন করা উচিত যাতে শ্রমিক এবং মালিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে এবং সংঘাতের যাতে কোন অবকাশ না থাকে।

আদৌ শ্রমিক স্বার্থ রক্ষিত হবে কি?

শ্রমিক সংগঠনগুলো মালিকদের এসব কথাকে বাৎসরিক কান্নাকাটি হিসাবেই দেখছে। জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক অলক চক্রবর্তী বলেন, পাকিস্তানে এখন চা রপ্তানি বন্ধ থাকায় চাহিদা কিছুটা হলেও মার খেয়েছে এতে সন্দেহ নেই। তবে এমন পরিস্থিতি কিন্তু সাময়িক। তাছাড়া এবারের বোনাস হবে গত আর্থিক বছরের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে। সেবার কিন্তু চায়ের বাজার যথেষ্ট তেজী ছিল। আলোচনা করেই আমরা শ্রমিকদের প্রাপ্য আদায় করব। ফোরামের আরেক আহ্বায়ক মনিকুমার দার্নাল বলেন, প্রতিবার ঠিক বোনাস বৈঠকের আগেই মালিকদের চোখে চা শিল্পের পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। এই রহস্য সমস্ত শ্রমিকদের জানা। খোলামনে আলোচনা করেই বোনাস চুক্তির রফা হবে। বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কুড়ি শতাংশ হারে বোনাসের দাবি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে। এছাড়াও যে সমস্ত শ্রমিক ক্ষুদ্র চা শিল্পে কাজ করে তাদেরকেও যেন বোনাস দেওয়া হয় সেই দাবির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতবার চা শ্রমিকরা পেয়েছিল ১৯.৫০ শতাংশ হারে। ১৮ সালে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে বোনাসের হার ছিল ১৯.৭৫ শতাংশ। তার আগে টানা ছয় বছর কুড়ি শতাংশ হারে বোনাস পেয়েছিলেন উত্তরের চা শ্রমিকরা। প্রস্তাবিত অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি (ও এইচ এস) বিলে শ্রমিক স্বার্থরক্ষা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা অভিজিৎ মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, চা শ্রমিকদের অবস্থান আলাদা। তাই শুধু মজুরি বাড়ালেই হবে না। অবসরকালীন বয়স ৬০ বছর নিশ্চিত করতে হবে এবং জমির পাট্টা দেওয়ার মত কিছু বিষয় রাখতে হবে বিল বা আইনে।

স্পেশাল প্যাকেজের দাবি কেন উঠছে?

কঠিন সময়ের মুখোমুখি উত্তরের চা শিল্প। বর্তমান পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন না ঘটলে চরম সমস্যায় পড়তে হবে শিল্পপতি থেকে শ্রমিকদের এমনই দাবি করছে মালিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্পেশাল প্যাকেজ চাইছে সংগঠনটি। সংগঠনের তরফে ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিত রাহার বক্তব্য, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি হলেও গত কয়েকবছর ধরে বাড়ছে না চায়ের দাম। ফলে চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে চলছে চা শিল্প। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কয়েকদিনের মধ্যে পুজোর বোনাস দিতে হবে শ্রমিকদের, এমন পরিস্থিতিতে চা শিল্পে মন্দা চলছে বলে দাবি করছে চা বাগান মালিকদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ সিসিপিএ। শিলিগুড়িতে বসেছিল ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। চা শিল্পে যে দুর্দশা চলছে তার প্রমাণ দিতে সাংবাদিক বৈঠকে বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। গত পাঁচবছর ধরে নিলামে গড়পড়তা চায়ের দাম কত, নানা কারণে উৎপাদন খরচ কীভাবে বৃদ্ধি হয়েছে এমন কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়। গত বছর শ্রমিকদের মজুরি ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ায় চা শিল্পের ওপর চাপ পড়েছে বলেও দাবি। গত বছর দেশে চা উৎপাদন হয়েছিল ৯৭৯ মিলিয়ন কেজি। চলতি বছর তা বেড়ে হয়েছে ১৩৩৯ মিলিয়ন কেজি। সিসিপি এর বক্তব্য যে হারে উৎপাদন বেড়েছে তার সঙ্গে সমতা রেখে সরবরাহ হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পরিস্থিতির অবনতি হবে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাঁচা চা পাতার ন্যূনতম বেঞ্চমার্ক মূল্য বেঁধে

বর্তমানে চা শিল্পে দুর্দশা চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে চা শিল্পপতিদের তরফে এবং এই যুক্তি খাড়া করে তারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিপক্ষে। কিন্তু বাজার যখন ঠিক রয়েছে তখন কেন মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। শিল্পপতিদের বক্তব্য, গুণগতমান বজায় রাখতে গিয়ে এই মরশুমে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে।

দেওয়া, নিলামের ক্ষেত্রে সংস্কার আনতে অধ্যাপক মহাদেবন এর সুপারিশগুলি কার্যকরের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি স্পেশাল প্যাকেজের দাবি তোলা হয়েছে। ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন এন পাল চৌধুরী বলেন, ব্যাংকিং সাহায্যের ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য কার্যকরী মূলধন এর উপর ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

চা শিল্পে দুর্দশার দাবির বাস্তবতা আছে কি?

উৎপাদনে তেমন হেরফের ঘটেনি। পরিবর্তন হয়নি তেমন দামের ক্ষেত্রেও। কিন্তু বর্তমানে চা শিল্পে দুর্দশা চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে চা শিল্পপতিদের তরফে এবং এই যুক্তি খাড়া করে তারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিপক্ষে। কিন্তু বাজার যখন ঠিক রয়েছে তখন কেন মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। শিল্পপতিদের বক্তব্য, গুণগতমান বজায় রাখতে গিয়ে এই মরশুমে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেকটাই। তাই মন্দার বাজারে অতিরিক্ত ব্যয় কখনই সম্ভব নয়। কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান সময়ে চা শিল্প কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই তথ্যটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। ন্যায্য বেতনের দাবিতে আন্দোলনের মাঠে রয়েছে ফ্যাক্টরির বাবু ক্লার্ক সহ অফিস স্টাফেরা। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভুখা মিছিল এর ডাক দিয়েছিল কোনও কোনও শ্রমিক সংগঠন। এমন পরিস্থিতিতে মজুরি এবং বেতন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের একটা মহল সক্রিয় বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চা শিল্পপতিরা চলছেন বলে দাবি শিল্পপতিদের। যদিও উৎপাদন এবং বাজার দরের পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট নয়। শিলিগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের সেন্টারের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে চলতি আর্থিক বছরে দাম কমে নি, বরং বেড়েছে এবং কয়েক মাসের মধ্যে আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তবুও পরিস্থিতি সুখকর নয় বলে দাবি চা বাগান মালিকদের। তাদের বক্তব্য, নিলামের দাম দিয়ে সমস্ত কিছু যাচাই করা ঠিক হবে না। এখন উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। ফলে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে চা শিল্প। গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে গেছে। স্থানীয় বাজার নষ্ট হয়েছে। অন্য দেশগুলো বাজার ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু আপৎকালীন কৌশল গ্রহণ করে। এখানে সেই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চা উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি করছে

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এবার উত্তরবঙ্গের চায়ের উৎপাদন মার খেয়েছে। উত্তরবঙ্গে চায়ের উৎপাদন কমে গেছে প্রায় ২৫ শতাংশ। বৃষ্টির অভাবে বেড়েছে লাল মাকড়সার আক্রমণ এবং এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে উত্তরবঙ্গের চা চাষীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে এই অবস্থা চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মরসুমের শুরুতে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলেও পরে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়েছে। এর ফলে উত্তরে বৃষ্টির ঘাটতি এবার অনেকটাই। আবহাওয়া দপ্তরের একাধিক ঘোষণা অনুযায়ী বৃষ্টি হলে এই ঘাটতি পূরণ হবে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি? চলতি বছরের জুলাই মাসে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আগস্ট মাসে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দেখা নেই বললেই চলে। তার ওপর গত এক সপ্তাহ ধরে তাপমাত্রা বেড়েছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালীপনার মাশুল দিতে বসেছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। নাগরাকাটা গবেষণা সংস্থার এগ্রোনমি বিভাগের প্রধান সৌমেন বৈশ্য বলেন, উত্তরের আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা চায়ের উৎপাদনের জন্য একেবারে উপযুক্ত নয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী। সাধারণত ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকারক। সেখানে তাপমাত্রা পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। আসলে চা শিল্পে সমস্যা বহুমুখী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শুধু নিরীহ, নির্বিরোধি শ্রমিকেরা তার মাশুল দেবে কেন? তাই কেন্দ্রীয় সরকার মান্ধাতার আমলের প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট বাতিল করে যদি সত্যিকারের কমন ওয়েজ সিস্টেম বা ঐ জাতীয় কিছু চালু করে তাহলে প্রতিবছর এই চাপান উতোর বন্ধ হবে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে। মালিকেরাও লভ্যাংশ পাক, শ্রমিকেরাও ন্যায্য মজুরি যা তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ডুয়ার্সের গান্ধী যজ্ঞেশ্বর রায়

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা

দেবব্রত চাকী

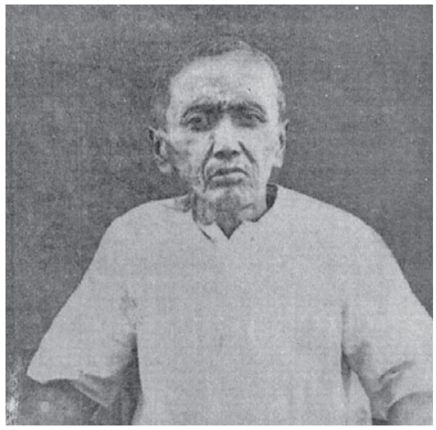

জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শুরু হয় পথ চলা। অবশেষে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বদান। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বহু আন্দোলনের সেনাপতি যজ্ঞেশ্বর রায় ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিধায়ক নির্বাচিত হন।

ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চাশোর্ধ সংগ্রামী যুবক স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ফালাকাটা-মাদারিহাট কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিধানসভার কাজে ঘন ঘন কলকাতায় যাবার প্রয়োজন। সেই সময়কালে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে রেলপথই ভরসা। কিন্তু রাঙ্গালিবাজনা থেকে ট্রেন ধরতে ছুটতে হয় হয় মাদারিহাট, নয়তো দলগাঁও (পড়ুন বীরপাড়া)। দুটো স্টেশনই রাঙ্গালিবাজনা থেকে প্রায় সমদূরত্বে। অতএব মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে আবদার জানালেন পূর্বোল্লিখিত দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি স্টেশন নির্মাণের। বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর রায়ের আবদারে প্রায় আমলই দিলেন না ডা. রায়। যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন কী করে স্টেশন আদায় করতে হয় তা আমি জানি। এরপর দীর্ঘদিন চুপচাপ। হঠাৎ একদিন হৈ চৈ রাঙ্গালিবাজনায়। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছেন বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর রায়। অতঃপর পা ভেঙে বাড়িতে শয্যাশায়ী। দীর্ঘদিন খবর নেই বিধায়কের। মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় খোঁজখবর শুরু করলেন যজ্ঞেশ্বর রায়ের। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে স্তম্ভিত। বিধায়ককে আশ্বস্ত করলেন স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে। অতঃপর মাদারিহাট ও দলগাঁও স্টেশনের মাঝে গড়ে উঠল নতুন স্টেশন 'মুজনাই'। পাহাড়ি নদী মুজনাইয়ের নামে নামকরণ হল স্টেশনের।

অদম্য জেদ নিয়ে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাতে তুলে নেন জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা। হয়ে ওঠেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সৈনিক। এরপর কেবল রাজনীতি আর রাজনীতি। পড়াশোনা এককথায় শিকেয়। পিতা মোহন সিং-য়ের সঙ্গে বিস্তর মনোমালিন্য। তবে সমর্থন পেলেন কাকা দ্বারিকানাথ রায় প্রধানের কাছে। তবে এর মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন আরও অনেক ঘটনাবহুল। তাঁদের আদি নিবাস জলপাইগুড়ির নিকটে তিস্তা নদীর পূর্বতটে মরিচবাড়ি গ্রামে। বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের দোমোহানির নিকট এই গ্রামটি ১৯১৩ সালের তিস্তার প্রলয়ংকারী বন্যায় তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। ভিটে-মাটি, জমি-জিরেৎ হারিয়ে যজ্ঞেশ্বর রায়ের পরিবার অর্থাৎ তাঁর পিতা মোহন সিং রায় সপরিবারে এসে থিতু হলেন রাঙ্গালিবাজনায়। তিস্তার কোপে সর্বহারা প্রায় নিঃস্ব একটি পরিবারের শুরু হল নতুন করে পথচলা। জঙ্গল পরিস্কার করে চাষ-আবাদই মুখ্য জীবিকা। খাসমহল এলাকা বলে জঙ্গল পরিস্কার করে আবাদ করলে কয়েক বছর খাজনা মকুব। কথায় বলে বিপদ যখন আসে তখন নাকি সবদিক থেকেই আসে। বেজে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। দেশ জুড়ে আর্থিক সংকট। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধবন্ড ছাড়ল দেশের জোতদার ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে। নোটিশ এসে পৌঁছাল সাবেক মরিচবাড়ির জোতদার রাঙ্গালিবাজনার নিঃস্ব কৃষক মোহন সিং রায়ের কাছে। এক অসহনীয় অবস্থা। দুর্যোগ নেমে এল যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনে। সদ্য ফালাকাটা স্কুল থেকে মাইনর পাশ করেছেন। ছাত্র হিসেবে যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন। আর্থিক কারণে তবে কি পঠন-পাঠনের এখানেই যবনিকা? এক গভীর সংকটের দোরগোড়ায় যজ্ঞেশ্বর রায়!

কথায় বলে যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। এরকম এক সংকটকালে যেন ঈশ্বরের দূত হিসেবে আবির্ভূত হলেন আলিপুরদুয়ারের আইনজীবী তথা একজন জাতীয়তাবাদী অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব—রসিকলাল গাঙ্গুলি। সঙ্গে সুপরিচিত মুখ ডা. ইন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী। উভয়ের সাহায্য ও সহযোগিতায় যজ্ঞেশ্বর রায় ভর্তি হলেন আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে। শুরু হল নতুন উদ্যোমে পঠন-পাঠন। হঠাৎ জীবনে নেমে এল আরেকটি বিপর্যয়। ১৯১৫ সালে তাঁর মা পানেশ্বরী দেবী ইহলোক ত্যাগ করলেন। পরিণতিতে পারিবারিক সংকটের আবহে যজ্ঞেশ্বরের পঠন-পাঠন আবারও প্রশ্নের সম্মুখীন। এবারের সংকটে তাঁর সহায় হন তাঁর কাকা দ্বারিকানাথ রায়। এভাবে চলছিল আলিপুরদুয়ারে তাঁর ছাত্রজীবন। এভাবে চলতে চলতে ১৯২০ সালে এল তাঁর জীবনে রাজনীতির হাতছানি। তবে এ রাজনীতি ইংরেজ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার রাজনীতি। সদ্য শেষ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ওদিকে পাঞ্জাবে সংঘটিত হয়েছে জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকান্ড। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে। অতঃপর দেশজুড়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক। জলপাইগুড়ির খগেন দাশগুপ্ত ও জগদিন্দ্রদেব রায়কতের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের শিবদয়াল পাল ও রসিকলাল গাঙ্গুলির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান যজ্ঞেশ্বর রায়ের তরুণ মনকে আন্দোলিত করে তোলে। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন রাজনীতিতে। জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শুরু হয় পথ চলা। অবশেষে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বদান। কুমারগ্রামের কুলকুলির হাটে মঘা দেওয়ানির নেতৃত্বে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ১৯২৩ সালে ফালাকাটায় বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ও আইন অমান্য কর্মসূচীতে নেতৃত্বদান কিংবা ১৯৩০ সালে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, মাদারিহাট ইত্যাদি হাটে হাটে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ধূপগুড়ি হাটে গ্রেপ্তার বরণ ও একবছর কারাবাস তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বিশেষ।

এরপর ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন। সমগ্র দেশের সঙ্গে উত্তাল আলিপুরদুয়ার মহকুমা। মাদারিহাট থানা অভিযান থেকে শুরু করে কুমারগ্রাম থানা দখল আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম মুখ যজ্ঞেশ্বর রায়। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বহু আন্দোলনের সেনাপতি যজ্ঞেশ্বর রায় ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিধায়ক নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জলপাইগুড়ির রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের মৃত্যুতে ওই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক নির্বাচিত হবার পর জনপ্রতিনিধি হিসেবে শুরু হয় নতুনভাবে পথচলা। এরপর এল বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। রাজনীতির ময়দানে থেকে দেশগড়ার কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগের পালা।

ওদিকে সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরে রাঙ্গালিবাজনায় জঙ্গল কেটে আবাদী জমি বৃদ্ধি করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবার পাশাপাশি তিস্তার গর্ভে চলে যাওয়া জমি পুনরায় চর হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তা বিক্রি করে যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু কৃষকে পরিণত হন যজ্ঞেশ্বর রায়ের পিতা মোহন সিং রায়। অতঃপর পুত্র যজ্ঞেশ্বরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে সংসার জীবনে প্রবেশ করান। যদিও সংসার ধর্ম পালন তাঁর রাজনীতিতে

ছেদ ধরাতে পারেনি। উত্তর স্বাধীনতাপর্বে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ফালাকাটা-মাদারিহাট কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করলেও ১৯৬২ সালে তিনি কংগ্রেস দলের মনোনয়ন লাভে অসমর্থ হন। ১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বাধীন বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ময়নাগুড়ি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। যদিও এই বিধানসভা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৬৯ সালে পুনরায় বিধানসভার অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যজ্ঞেশ্বর রায় তার পুরনো দল জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে জয়লাভ করেন। যদিও ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হননি। তবে ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় মোহন্তের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত যজ্ঞেশ্বর রায় মহাত্মাজীর আহ্বানে সমগ্র ডুয়ার্স জুড়ে ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং জনমানসে তার যে প্রভাব পড়েছিল তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যজ্ঞেশ্বর রায়কে ডুয়ার্স গান্ধী নামে অভিহিত হতে দেখে। এটাই হয়ত বা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবথেকে বড় সার্থকতা। তবে আপাদমস্তক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যজ্ঞেশ্বর রায় সমাজ গঠনে বিশেষ করে শিক্ষার প্রসারে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা এক কথায় চিরস্মরণীয়। তাঁর উদ্যোগে এবং স্থানীয় বেশকিছু শিক্ষানুরাগী মানুষের সহযোগিতায় যথাক্রমে রাঙ্গালিবাজনার মোহন সিং হাইস্কুল, কুমারগ্রামের মদন সিং হাইস্কুল, ফালাকাটা হাইস্কুল, জটেশ্বর হাইস্কুল, ডাউকিমারি ডি. এন. হাইস্কুল, আমগুড়ি হাইস্কুল, হেলাপাকড়ি হাইস্কুল, কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুল, জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও আরও অনেক জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে।

যজ্ঞেশ্বর রায় একদিকে যেমন ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আবার অন্যদিকে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে 'সাপ্তাহিক উত্তরবঙ্গ' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্য জগতেও বিচরণ করেন। ১৯৫১ সালে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক কার্য বিশেষ। বিষয়টির তাৎপর্য অপরিসীম। যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁর বাড়ির নিকটে একটি হাট স্থাপন করেন, যা এম.এন.এ. হাট নামে পরিচিত। যদিও এই হাটটি তাঁর জীবনে হয়ে ওঠে বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় এই হাটেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৯০০ সালের ২২শে মে ভূমিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর আততায়ীর শাণিত অসির আঘাত তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। যা আজও রহস্যের। অনেকের মতে এই হত্যাকান্ড রাজনৈতিক। এই হত্যাকান্ডের পেছনে কে বা কারা তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে অতি বাম শক্তির সক্রিয়তা ও খতম রাজনীতির প্রাবল্য সমাজে যে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শ্রীহরিমোহন বর্মণ, প্রসেনজিৎ বর্মণ, উমেশ শর্মা, জয়প্রকাশ রায় ও সুশীল রায় সরকার।

একটি প্রাপ্তবয়স্ক রূপকথা

উত্তরের উপকথা

ওঁরা খেটে খাওয়া হলেও জনসাধারণ হয়ে উঠতে পারেননি আজও। আমাদের এই প্রান্তরাজ্যভূমি যখন আলো জল ঘর রেশন রাস্তা ইত্যাদির সমস্যা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত বা আন্দোলিত, তখন ওঁরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট নিয়ে। বিলক্ষণ, রূপান্তরকামীদের কথাই বলছি। এই ডুয়ার্সেরই শহরে বন্দরে গ্রামে জেলায় মহকুমায় মফস্বলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছিন্নপরিচয় মানুষগুলির কথাই বলছি যাদের এখনও প্রাপ্তি বলতে জুটেছে ভালোবাসার বদলে দয়া, সহমর্মিতার বদলে করুণা এবং অবশ্যই সহযোগিতার বদলে অবজ্ঞা-অবহেলা।

অথচ ভাল করে ভাবলে এঁদের জীবনে শিক্ষা, উপার্জন, চিকিৎসার মতন গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য জিনিসগুলি প্রায় নেই। মনের সঙ্গে শরীরের যতই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাক, তার কোনও পরামর্শ বা দিকনির্দেশ নেই। দায়সারা ভাবে প্রশাসন যতই এঁদের সর্ববিধেতা দিয়ে থাকুন, স্বাভাবিক নারী-পুরুষের সমাজ এদের কোল দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে নেই।

এত নেই-এর মধ্যেও এঁদের নিজস্ব জগৎ আছে, সে জগতের নির্দিষ্ট কানুন আছে, আহ্লাদ আছে, পরিজন আছে এবং অবশ্যই আছে সংস্কৃতি। আছে গান, দেবার্চনা এবং গল্প। সে গল্প বহু প্রবন্ধে বহুবার লেখা হয়েছে। তবু সাহস করে বলি, লোককথা বা লোকমুখে বেঁচে থাকা কাহিনি কারোর ব্যাক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাতে নেই কারোর মৌলিক অধিকার। কাজেই এ অবসরে না হয় আরেকবার সেরকম একটি গল্প বলা যাক। বহুচর্চায় গল্প সন্মানিতই হয়, তাছাড়া, রূপকথা বললেই সবার মনে শিশুপাঠ্য কাহিনি ভেসে ওঠে। এই গল্পটিকে অ্যাডাল্ট রূপকথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না মোটেও।

বাপান গোষ্ঠীর দলপতি চরণ রাজা। তাঁর আটটি মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী হচ্ছেন বহুচেরা। চাঁপা ফুলের মতন রং, ওল্টানো হাঁড়ির মতন নিতম্ব, জোড়া বেলফল বুক, মেঘঘন চুল, মোটের ওপর তিনি সুন্দরী এবং যৌন আবেদনময়ী।

একদিন হল কী, বহুচেরা তাঁর আর সব বোনদের সঙ্গে রথে চড়ে বনবিহারে গেছেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে ফুল তুলেছেন, খোঁপায় পড়েছেন, জলেশয়ে গা ধুয়েছেন, তারপর মাঝবেলায় বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে পাখিদের কাকলি শুনতে শুনতে বোনদের সঙ্গে গল্প করছেন।

এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, হারে রে রে করতে করতে তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল দস্যুদল। সেই দস্যু আবার যে সে নয়, চরণ রাজার তীব্র প্রতিপক্ষ বাপিয়া দলের প্রধান। রাজাকে জব্দ করার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, অতএব তিনি বহুচেরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কাপড় খোলো। তোমাকে নগ্ন দেখব, তোমার সর্বস্ব লুটব।

বহুচেরা কিন্তু নিরস্ত্র ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিল শান দেওয়া তলোয়ার। থাকলে কী হবে, তিনি যে বংশের কন্যা সেখানে প্রাণহত্যা মহাপাপ। শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে না চাইলে আত্মহত্যা চলবে কিন্তু শত্রুর প্রাণ নেওয়া চলবে না।

রাজকন্যা বহুচেরা রাজরীতি ছাড়তে পারলেন না। এক কোপে নিজের স্তন দুটো কেটে ফেললেন। আর বোনদেরও বিপদ থেকে বাঁচাতে একইভাবে স্তনকর্তন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আটটি সুদর্শনা রাজকুমারী বনের বুকে ঢলে পড়লেন। রক্তে ভিজে গেল শ্যামল কোমল ঘাস, বাতাসে বাতাসে হাহাকার জাগল এমন, গোটা বন যেন শ্মশান।

আর কী দাঁড়ায়? বাপিয়াদল প্রাণ হাতে পালিয়ে বাঁচল। দেখতে দেখতে রাত নেমে এল। এক অজানা জাদুবলে সবার অজান্তে আটখানি মৃতদেহে আটটি কদমগাছ গজাল। আর শুধু তাই নয় আটজোড়া স্তনের ওপর ফুঁড়ে উঠল আটটি শিলা পাহাড়।

ওদিকে ঘুমের মধ্যে বাপিয়ার সর্দার স্বপ্ন দেখল এক তেজস্বিনী নারী এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছেন। নারীর চারটি হাত, যার দুটিতে তলোয়ার আর ত্রিশূল। জগদম্বা বলেই ভাবত সর্দার, কিন্তু সে নারী মোরগ বাহনা, অচেনা দেবতী যাঁর দুচোখে জ্বলছে রাগ আর ঘৃণা। তিনি সর্দারকে অভিশাপ দিলেন, নারীকে ধর্ষণ করতে গিয়েছিলি পাষণ্ড, রাতারাতি তোর এবং তোর দলের সবার অণ্ডকোষ খসে যাবে। মরবি, সবশুদ্ধু প্রাণে মরবি।

ভয়ঙ্কর অভিশাপ! সর্দার ত্রাহি ত্রাহি স্বরে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল, বারবার মাথা ঠুকতে লাগল দেবীর পায়ে। দেবী কিছুটা গললেন।

বললেন, প্রাণ দান করতে পারি এক শর্তে।

সর্দারের তখন বাঁচার তাগিদ। নতজানু হয়ে শর্ত মানতে রাজি হল।

লিঙ্গচ্ছেদের অভিশাপ দিয়ে ফেলেছি কাজেই আর তুই পুরুষ হতে পারবি না, দেবী বললেন, নারীর বেশ ধরেই তোকে বেঁচে থাকতে হবে সারা জীবন। তবে হ্যাঁ, ওই বনে আটটি শিলা পাহাড় গজিয়েছে। সেখানে মন্দির গড়ে আমার পূজা প্রচার করিস যদি, মান বাঁচিয়ে টিকতে পারবি সারা জীবন। জেনে রাখ, আমি দেবী বহুচেরা।

দেবীর স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল বাপিয়া দল।

পুরুষত্ব যেমন ঘুচে গিয়েছিল, তেমনই তাদের ঘুচে গিয়েছিল হিংসা, নারীলোভ এবং অত্যাচার করার মানসিকতা।

হিন্দুদের হিজড়ে বলুন, বৌদ্ধদের কতি বা মুসলিমদের মুখান্নাতুন-এই কিংবদন্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে আদতে এই অস্পষ্টলিঙ্গ মানুষগুলি অহিংস নির্লোভ এবং নিরীহ।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

ঢাকিদের ওই আসছে দিন!
তবু ঢাকিরা ঢাকশিল্পী হলেন না কেন?

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

"ঢাকের উপর কাঠি না পড়লে দুর্গাপূজার আবহাওয়াই তৈরি হয় না"। এ কথা এই ডিজিটাল ডিজে যুগেও অস্বীকার করা যায় না মোটেই। তরুণ বয়সে একা একা কলকাতায় গিয়েছিলাম দুর্গাপূজার প্রাক্কালে। শিয়ালদা স্টেশনে একদিন সকালে কয়েকশ ঢাকিকে একসঙ্গে বাজাতে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝেই তাঁরা একযোগে ঢাকের বোল তুলছিলেন নেচে নেচে। তখনকার দিনে পূজা কমিটির মানুষজন দরদাম করে বায়না করতেন অথবা সরাসরি পূজা মন্ডপে নিয়ে তুলতেন। অবশ্য কতগুলো পূজা কমিটি বিশেষ করে বাড়ির পূজাগুলোতে একই ঢাকি পরম্পরাগত ভাবে বাজাতেন।

উত্তরবঙ্গের পূজায় একই ঢাকি, দু-একজন সন্তানসহ বছরের পর বছর, পূজার আগেই মন্ডপে পৌঁছে যান। আমার শহরের শতাব্দী প্রাচীন দুর্গাপূজার বরিষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছিলেন, ১৯৬৯-৭০ সনে দুই ভাই আসত ঢাক বাজাতে, সঙ্গে ওদের এক ভাই-এর ১০-১২ বছরের ছেলে। প্রায় সাতদিন ওরা স্থানীয় এক প্রাইমারি স্কুলে থাকত। চাল ডাল আনাজপাতি পূজা কমিটি ব্যবস্থা করত। ভোগের প্রসাদও নিত্যদিন মিলত। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকের আওয়াজে এলাকা মাত হয়ে থাকত। সন্ধ্যায় প্রতিদিন আরতি হত, তখন ঢাকিদের তৎপরতাও বেড়ে যেত। আরতির সবচেয়ে বড় শিল্পী এল.আই.সি-র রবি। ও এসে দেড়টি ঘণ্টা আরতি করত। ঢাকি তখন কঠিন পরীক্ষায়। ঢাকের তাল, লয় ঠিক রাখা ছিল কঠিন কাজ। বিসর্জনের পরদিন সকালে পাড়ার বাড়িগুলোর সামনে ঢাকের বাজনা শোনা যেত। প্রতিটি গৃহস্থ চাল, ডাল তরকারি ভুজ্যি সাজিয়ে দিত, সঙ্গে কিছুটা নগদ। প্রয়োজনে একদিন অতিরিক্ত থেকে তারা ভোজ্য ও অর্থ সংগ্রহ করতেন। সেদিন ভদ্রলোক আরও জানালেন, সে সময় পূজা কমিটি, দুজনের মজুরি বাবদ ৫০ টাকা, আর দুটো ধুতি দুটো শাড়ি আর বাচ্চাটার জামা প্যান্ট দিত। তবে তার থেকেও নাকি বেশি প্রাপ্তি হত বাড়ি বাড়ি ঢাক বাজিয়ে। সে সময় খুঁটি পুজোর প্রচলন ছিল না। কোনও কোনও মন্ডপে কাঠামো পুজোর প্রচলন ছিল।

দোমোহনিতে একটা পাড়ায় বেশ কয়েক ঘর মানুষ বাস করেন, বয়স্করা প্রত্যেকেই ঢাক বাজাতে পারেন। মাঝে মাঝে নিজেরা মহড়া দিয়ে থাকেন। দোমোহনিতে গিয়ে সুরেন দাস মশাইকে ঢাকের কথা বলতেই তিনি ছ'বছর আগে বানানো একটা বড় ঢাক এনে উঠানের কোণে নিচু বাঁশের মাচায় রাখলেন।

দোমোহনিতে একটা পাড়ায় বেশ কয়েক ঘর মানুষ বাস করেন, বয়স্করা প্রত্যেকেই ঢাক বাজাতে পারেন। মাঝে মাঝে নিজেরা মহড়া দিয়ে থাকেন। দোমোহনিতে গিয়ে সুরেন দাস মশাইকে ঢাকের কথা বলতেই তিনি ছ'বছর আগে বানানো একটা বড় ঢাক এনে উঠানের কোণে নিচু বাঁশের মাচায় রাখলেন। বাজানোর অনুরোধ করতেই বললেন, অনেকদিন বাজানো হয়নি তাই যন্ত্রটা বসে গেছে।

বাজানোর অনুরোধ করতেই বললেন, অনেকদিন বাজানো হয়নি তাই যন্ত্রটা বসে গেছে। একটু গরম করে, দুটি কাঠি নিয়ে বাজনা শুরু করতেই দু-একজন করে এসে উঠোন ভরে উঠল। সুরেনবাবু জানালেন, "আমরা বংশ পরম্পরায় ঢাক বাজাই। ঢাক আমদের পূজার জিনিস। আমি সাত বছর বয়সে থেকে বাবার কাছে ঢাক বাজাতে শিখি। তখন আমি ঢাক কাঁধে নিতে পারতাম না। একটা পোক্ত ঢাকের ওজন কমবেশি ৩০ কেজি।"

বয়স হয়েছে উনার, পূর্ববঙ্গ থেকে সপরিবারে এসেছেন ১৯৫০ সালে। তখন বয়স ছিল ১০ বছর। বাবা মা, তিন ভাই বোন, দুই কাকা ও ঠাকুমাকে নিয়ে আট জনের সংসার। তখন দোমোহনির এ দিকটায় প্রচুর ঝোপ জঙ্গল। পশ্চিমে তিস্তা নদী। এখন এত বড় বাঁধ দেখা যাচ্ছে, তখন পাহাড়ে একটু বৃষ্টি হলেই তিস্তার জলে ধানের খেত ভেসে যেত, মাঝে মাঝেই ঘরের ভিতর এক কোমর জল। সরকারি লোকজন রিলিফ নিয়ে আসত। তিতা চিড়া আর পচন ধরা গুড়। পরে অবশ্য রিলিফের বাবুরা জিআর-এর টোকেন দিত, দেখালেই বিনা পয়সায় জন প্রতি সপ্তাহে দুই সের চাল, অল্প কেরোসিন পাওয়া যেত। বাবা ও দুই কাকা তখন ভূমিহীন কৃষক। তাদের মজুরির পয়সায় সংসার চলত।

শহরের এক বড় এবং প্রাচীন পুজো কমিটির তরুণ কর্মকর্তা বললেন, এক সময় যে ঢাকির মজুরি বাবদ প্রাপ্য ছিল ৫০ টাকা সেই ঢাকি গত বছর মজুরি নিয়েছিল তেইশ হাজার টাকা। এ বছর দুটো ঢাক, একট ঢোল ও একটা কাঁসর এই নিয়ে চারজনের টিমের মজুরি নির্ধারিত হয়েছে পঁচিশ হাজার। আমার মনে পড়ে আলিপুরদুয়ারের এক লোক সংগীত শিল্পী এবং বড় মাপের ঢোল বাদক প্রয়াত বলরাম হাজরার কথা। তিনি এক বড় মাপের সংগীত সম্মেলনে বাজাতে এসেছিলেন। মানুষটির নানা রকম তাল বাদ্যে অবাধ বিচরণ। বাজনার টানে অতি অল্প বয়সেই সংসারে তিনি একলা সাধক। তিনি বলেছিলেন "লোক-বাদ্য এলাকায় বহু মানুষ শুনতে চান কিন্তু কালোয়াতি বাদ্য যন্ত্রের মত সম্মান ঢাকশিল্পীরা পান না"। লোকসংগীতের সাধক পুরুষ অমর পাল তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, উনার গানের সঙ্গে তিনি সঙ্গত করেছেন। শ্রদ্ধেয় অমর পাল কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বলরামবাবুর মত

ঢোলবাদ্য এ রাজ্যে ক'জন বাজান? ভদ্রলোক যোগ্য সম্মান পেলেন না। বলরামবাবু বলতেন, ঢাক একটা বিশাল মাপের ও বড় ওজনের যন্ত্র হওয়ায়, স্টেজে নিয়ে নড়াচড়া করা বা বাজাতে একটু অসুবিধেই হয়। তাছাড়া শিল্পীর গান, ঢাকের আওয়াজে চাপা পড়ে যায়"।

ঢাক শিল্পীরা এখন কেমন আছেন? ঢাকের বাজনা তাদেরকে বছরভর কাজ দিতে পারে না। মূলত পূজার সময় তাদের ডাক পড়ে। ব্যতিক্রমী দু-একজন ছাড়া শিল্পীদের বাস গ্রামে। তাদের বেশির ভাগই উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে দেশ ভাগের পরই এসেছেন। নানা পেশায় যুক্ত হয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। ছোটখাট ব্যবসার কাজে বা অনেকেই কৃষি শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। যেমন ধূপগুড়ির নিখিল ডাক্তার আসলে একজন গুণী ঢাক বাদক। তিনি শৈশবে আসামে থাকতেন। তাঁর বাবার কাছে ঢাক বাজানো শিখেছিলেন। পরবর্তীতে ভাগ্যের অন্বেষনে ডুয়ার্সে আগমন। গ্রামে থাকেন, দুই পুত্রই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বলেছিলেন "ঢাকের আওয়াজ আমার কাছে পূজার মন্ত্রের সমার্থক। কিন্তু ডাক্তারবাবু ঢাক বাজায় এই ব্যাপারটা মানুষজন ভাল ভাবে নিতে পারে না"।

এদের মধ্যে শহরে বা তার আশপাশে যে দু-একজন ছিটকে এসেছিলেন তারা কিন্তু বছরভর কিছু না কিছু কাজ পায় অর্থাৎ ডাক আসে ঢাক বাজানোর। যেমন জলপাইগুড়ির কালীপদ, বয়স তার ৩৬ বছর। বিবাহিত, একমাত্র কন্যা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। নিজে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি। স্ত্রী মধু কিন্তু বিএ পাশ। জানা গেল পুরসভা থেকে তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাকা বাড়ি বানানোর জন্য পাওয়া গেছে। বর্ষাকাল শেষ হলেই বাড়ির কাজ শুরু হবে। কালীপদ বলছিল, "এখন গৃহস্থ বাড়িতে বার মাস নানারকম পূজা হয়। পাড়ার দুর্গাপূজায় গত বছর ছয় হাজার দিয়েছিল দু-জনের জন্য। এখন বারোমাস কালীপূজা হয়। তাছাড়া গণেশ পূজা, কার্তিক পূজা, মনসা পূজা, বাসন্তী পূজা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, এমনকি রাজনৈতিক মিছিলেও ঢাক বাজানোর বরাত পাওয়া যায়। চৈত্র মাস গাজনের সময়। তখন এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন কাজ পাওয়া যায়"। মধু বলছিল, "তখন গাঁজা ও কারন-বারি একযোগে চলতে থাকে, পয়সা বাড়িতে আসবে কোথা থেকে?" কালীপদ বলল "ঢাক বাজাতে দম লাগে। অতবড় ওজনটা কাঁধে নিয়ে আধ ঘণ্টা দেখ না ? তাই একটু নেশাটেশা কখনও করি। একবেলা বাজালেই এক-দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। চেষ্টা করলে ঢাক বাজিয়ে মাসে হাজার দশেক টাকা অনায়াসে রোজগার করা যায়"। এখনকার ছেলেরা আর কেউ ঢাক বাজাতে চায় না। আমাদের পরিবারের অনেকেই লেখাপড়া শিখছে, তাদের ঢাক বাজাতে মোটেই আর আগ্রহ নাই। কেউ কেউ রাজনীতি করেও কামাই করা শুরু করেছে। তবে সবাই চায় চাকরি করতে। এত চাকরি কোথায়? অনেকে কাঁচামালের ব্যবসা করে, আর লোকসান খায়। তবুও ঢাক বাজাতে আসবে না। বাপ ঠাকুরদার এই শিল্প তাহলে কে বাঁচিয়ে রাখবে? প্রশ্ন সেটাই।

ঢাক বাজাতে দম লাগে। অতবড় ওজনটা কাঁধে নিয়ে আধ ঘণ্টা দেখ না ? তাই একটু নেশাটেশা কখনও করি। একবেলা বাজালেই এক-দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। চেষ্টা করলে ঢাক বাজিয়ে মাসে হাজার দশেক টাকা অনায়াসে রোজগার করা যায়"। এখনকার ছেলেরা আর কেউ ঢাক বাজাতে চায় না। আমাদের পরিবারের অনেকেই লেখাপড়া শিখছে, তাদের ঢাক বাজাতে মোটেই আর আগ্রহ নাই। কেউ কেউ রাজনীতি করেও কামাই করা শুরু করেছে।

ঢাক শিল্পীদের নিয়ে বলতে গিয়ে মনে হয়েছে বাংলা মা সব লোকসংগীত শিল্পীকে তার কোলে আশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু ঢাক বা ঢোল সে জায়গা পেল কি? শচীনদেব বর্মনের সেই গান ভুলি কী করে?

"তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল"।

পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য 'জ্যোতি'-র উদ্যোগ

২০১০ সালে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা 'জ্যোতি' নামক একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিল। এলাকার পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনে সহযোগিতা করাই 'জ্যোতি'র মূল লক্ষ্য। এই কাজে কলেজের শিক্ষকরাও সংস্থাটির পাশে আছেন। এখন প্রায় ২০০ জন পড়ুয়াকে তাঁরা পড়াচ্ছেন নিখরচায়। দুটি কক্ষে দশম শ্রেণি অবধি পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের সাধারণ পাঠ দেওয়া ছাড়া কম্পিউটর শেখাবার ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। নান্দনিকতা চর্চায় জোর দেওয়া হয়। একজন পড়ুয়া পিছু একজন শিক্ষক— এই নীতি মেনে পড়ান সদস্যরা।

এর বাইরেও 'জ্যোতি'র সদস্যরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত। গত ১৪ই অগাস্ট সদস্যরা রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে জমায়েত হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক সুব্রত ভট্টাচার্য, সৌপায়ন মিত্র, প্রাক্তন সদস্য সৌম্যজিৎ দাস। প্রায় একশ জন ক্ষুদে পড়ুয়াদের হাতে রাখি বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি মিষ্টিমুখ এবং হৈ-হুল্লোড়ের

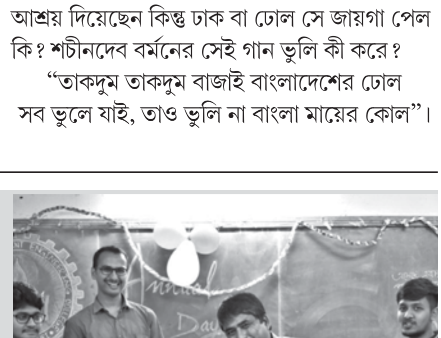

আয়োজন ছিল। সংস্থার বর্তমান সচিব সত্যম কুমার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কবির কলমে

উত্তরকথা

সুবীর সরকার

১।

সেই বড় বন্যার বছর ফুলমালার বাথানে চলে যাওয়া কুদ্দুস ও ইয়াসিন এত এত দিন পরে আবার ফিরে এসেছে, এই সংবাদ দলদলির ভরা হাটে ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল কইকান্ত ও রাধাকান্তর কাছে। তারা তখন এক অদ্ভুত উন্মাদনা টের পায় শরীরের পেশী ও স্নায়ুতে। ভরা হাট থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে তারা গরুর গাড়ির ছই এর ভিতর প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লে, আশেপাশের হাটুয়াদের ভিতর বেশ কৌতুকের জোগান দেয়, যেন বড় শহরের টকি তে দেখে ফেলা কোনও হাসির না ভুলে যাওয়া দৃশ্যখণ্ড। রাধাকান্ত ও কইকান্তর চোখে স্মৃতির এক তুমুল ঘোর। কইকান্ত রাধকান্তর দিকে বাড়িয়ে দেয় তামকু হুঁকো। কত কত বছর আগের কুয়াশা মাখা রাতের সময়গুলো যেন ফিরে আসে। হ্যারিকেনের আলোয় পালাগানের আসর। মাঝখানে আসর। তাকে ঘিরে গোল হয়ে চারপাশে শত শত মানুষ। ছোট ছাওয়া বুড়ির বেটি বুড়ার ঘর মাইয়োর মাও সবাই এসে জুটেছে। আর কুদ্দুস ও ইয়াসিন ছুকরি সেজে কোমর দুলিয়ে নাচছে। রাতের কুয়াশায় রাতপাখিদের ডানায় গিয়ে হামলে পড়ছে গানের পর গান—

'আরে শ্যাম কালা ও রে শ্যাম কালা
ছাড়িয়া দে মোর শাড়ির আঞ্চল যায় বেলা
বেলা ডুবিলে হইবে রে দেরি
দেরি হইলে মারিবে সোয়ামি রে'

রাধাকান্ত ও কইকান্তর তখন যৌবনকাল। শরীরে মনে উন্মাদনা। আসরে আসরে ঘুরে বেড়ায়। জীবনের রঙ্গে রঙ্গে দিন কাটে।

২।

কুদ্দুস ও ইয়াসিন ফিরে এসেছে প্রায় এক কুড়ি সাত বছর বাদে। বাপদাদার ভিটা ছেড়ে কী এক খোঁজে তারা চলে গিয়েছিল চার নদি, ছয় ফরেস্ট, দশ পনেরো বিলপুকুর পেরিয়ে আসাম দ্যাশের সেই এক মস্ত বাথানবাড়িতে। চারপাশে ঘন জঙ্গল। হাতি বাইসন ময়ূর চিতাবাঘ বনবিড়াল জঙ্গলিয়া কুকুর বিষধর সব সাপ ভর্তি। মস্ত সেই বাথানে কত কত মহিষ। মহিষের গালাত ঘানটি বাজে। বাথানে কত মানুষ। মুনসী। ইকবাল চাচা, তরণী দা, ময়না মাসী, দিলরুবা খালা,যতন, আলী, ফয়জল, চুরামনি ভগৎ, বাসন্তী আবো। ভালোয়া ও টুনটুনি নামে দুই কুকুর সারা বাথান জুড়ে টহল দেয়। আরও আছে বাথান ভরা বেড়ালেরা। বেশ কাটছিল বাথানের দিনগুলি। কুদ্দুস আর ইয়াসিনের ছিল ঘুরে বেড়াবার নেশা। নাচ ও গানের পাকে পাকে জড়িয়ে মরার নেশা। বাথানের মহিষের পিঠের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে গান ধরত—

'ও তুই একবার আসিয়া সোনার চান্দ
যাও মোকে দেখিয়া রে
অদিয়া অদিয়া যান রে বন্ধু
দাঁড়া না হন পার
ডাহুকির কানদনে আই মুই ছাড়িলং
বাপ ভাইয়ার দেশ রে'

নিশুতি রাতে গানের এই সুর, তরণীর দোতরার, আলীর সারিন্দায় এক জাদুপৃথিবী নামিয়ে আনত। জীবন মহার্ঘ্য এক জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিত তাদের সামনে— ""আচ্ছা, মানুষ বেঁচে থাকে কেন! আস্ত এক জীবন নিয়ে জনমভর কী করে মানুষ!" মাঝে মাঝে দল বেঁধে তারা চলে যেত ধুবুড়ির মেলায়। একবার সেখানেই তো তারা শুনেছিল রাজার বেটির সেই সব দেওজিনের আছর লাগা গান, সাথে কলুর কাঠি ঢোল, সীতানন্দ বুড়ার সারিন্দা। গান নেমে আসত গদাধরের জল ছুঁয়ে বালাবাড়িতে—

'ওরে দোন জনে যুক্তি করিয়া রে
ও জীবন আসিলং ভবের হাটে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলু মোকে
নিধুয়া পাথারে জীবন রে'

সে এক জীবন কেটেছিল বটে তাদের। বাথানের মহিষেরা জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকত। আর কে যেন আড়াল থেকে উন্মনা হয়ে গাইত—

'বাথান বাথান করেন মৈশাল ও
ও মৈশাল বাথান কইচছেন বাড়ি
যুবা নারী ঘরত থুইয়া
কায় করে চাকিরি মৈশাল ও'

৩।

দলদলির হাট থেকে ফেরার পথ যেন শেষ হয় না। কইকান্ত আর রাধাকান্ত শরীর ভরা পুলক নিয়ে বেশ অনুমান করতে পারল, কুদ্দুস ইয়াসিনরাও তো তবে বুড়ো হয়েছে। মাথাভরা পাকনা চুল। আচ্ছা তারা কি আবার সরু কোমর দুলিয়ে ধলা গিদালের কুশান পালার দলে নাচতে পারবে। এমত সম্ভাবনার চূড়ান্ত সমাধানে না পৌঁছেও কইকান্তরা কুদ্দুসদের বিয়ে সাদী সংসার টংসার হলো কিনা এতসবও কিন্তু ভেবেই ফেলে। ভাবনা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে চলে হুঁকো আর সালাইবিড়ি। এই যে ভরা কিংবা ভোরে ওঠা হাটের ভিতর থেকে তারা চলে এল, এরপর তো তারা মুখোমুখি হবে ইয়াসিন ও কুদ্দুসের, আরও অনেকের মতন, অনেক অনেক বছর পরে। এরপরে কি নুতন কোনও আখ্যানের ভেতর আমরা সবাই গিয়ে প্রবেশ করব ভরা নদীর জলের মতন!

৪।

পেছনে তখন পড়ে থাকছে দলদলির ভরা হাট। কত কত মানুষের, চেনা অচেনার এক চারণভূ মি। কইকান্ত আর রাধাকান্তর তখন গরুর গাড়ির দুলুনিতে কেমন এক ভ্রমবিভ্রমের নেশার পাকে জড়িয়ে পড়বার দশা হয়। না কি, তারা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়তে থাকে! একটা চলমান জীবনের দীর্ঘতাকে তারা অতিক্রম করে আসতেই থাকে। বামনডাঙ্গার সেই রাতের আন্ধারে মিশে থাকা আহত চিতাবাঘের হাহাকার থেকে সোমেশ্বরীর বিবাহনাচের দলে তুমুল নাচতে থাকার দৃশ্য ভরা হাটের ওপর উড়তে থাকা বগিলার মতন কেবলই পাক খেতে থাকে। ঘুমে ঢলে পড়বার আগে তাদের কানে এসে বাজে গান—

'চিলমারিয়া চিকন চিড়া
দিনাজপুরের খই
ও রে, অংপুরিয়া বাচ্চা বাপই
কুড়িগ্রামের দই'

জীবনের ওঠাপড়ার দিকে বারবার যেতে যেতে অনন্তের এক যাপনের কাছেই তো কইকান্তদেরকে যেতে হয়। আসা ও যাওয়ার ভিতর উত্তরাঞ্চলের হাটগঞ্জ পাথার নদী মেঘ ও মইষাল মিশে থাকে। ধান পাট সরিষার খেতে সাদা বকের দল, শালিকের দঙ্গল, খোরা জালে বন্দী ঝাঁক ঝাঁক মাছ সব নিয়ে মানুষের আবহমানের জীবনযাপন। নদী নদী ফরেস্ট ফরেস্ট এক জীবনে কেবলই জুড়তে থাকে উত্তরের নোলোক পড়া মেয়েদের গান—

'ঘাড়ত কেনে গামছা নাই
গামছাবান্ধা দই নাই
হাত্তির পিঠিত মাহুত নাই
মাহুতবন্ধুর গান নাই
দাড়িয়াবান্ধা খেলা নাই
বড় গাঙত পানি নাই
ও রে,আজি মন কেনে মোর
উড়াং রে বাইরাং করে'

৫।

কুদ্দুস, ইয়াসিনদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ধলা গীদালের কথা। ৫০-৮০ মাইলের ভিতর যত হাট, যত গাঁ গঞ্জ, যত ফরেস্ট সবখানেই মিথের মতন এই ধলা গীদাল। বাবড়ি চুল, কপালে অজস্র কুঞ্চন, হাতির দাঁতের চিরুনী চুলে ছুঁইয়ে তার কিসসা বলা, আর দোতরা বাজিয়ে সর্বশরীরে দুলুনি এনে গান শুরু করা উত্তরের এত এত জনপদগুলিতে তাকে ঘন জঙ্গলের প্রাচীন শালগাছের মতন উপাখ্যানের নায়ক করে তুলেছে। আর হাটে হাটে তাকে নিয়ে যে কত কত উপকথা ঘোরে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে এমনই হয়ে আসছে। গানে গাঁথায় তার বুনে যাওয়া কথা কিসসায় আস্ত এক সময় ও উত্তরের ভুবনজোত। হাতিজোতদারের বাড়ির ডাকাতির গল্প বল, কোচবিহারের রাজকুমারের সেই মহাশিকার বল, রাজকুমারী নীহারবালার বিবাহে দু রাত্তিরের গানপালার আসর বল, কালজানি নদীর সেই ভয়াবহ বন্যা বল, ঝামপুরা কুশানীর কুশান গানের যাদুতে আটকে থাকা বল, জল্পেশের ভরা হাটের সেই সিজিলমিছিল বল— সব সবকিছুই ধলা গীদালের আখ্যানের জরুরি অংশ হয়ে পড়ে। সে তার দল

গড়েছে কত কত বার। কত কত গীদালের গুরু সে। কত বাবুর ঘরের জ্ঞানী মানসি, খবরের কাগজের বাবুর বেটা, কত সিনেমার মানসি তাকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে। দ্যাশ বইদ্যাশে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু কোনকিছুতেই ধলা গীদালের মন জয় করতে পারে নি তারা। ধলা গীদাল এই হাট-টাট গঞ্জ-গাঁ নদী-মাঠের জঙ্গলের ছায়ায় ছায়ায় কেবল থাকতে চেয়েছে, আদি অনন্ত আবহমানের এক জীবন জড়ানো উত্তাপ জড়ানো জীবনের ভেতরেই। তার হাসিমুখের কুঞ্চনে সে কেবল গেয়েই চলেছে জীবনেরই গান—

‘ধান কাটে ধানুয়া ভাইয়া রে
ও জীবন, ছাড়িয়া কাটে ও রে নাড়া
সেই মতন মানুষের দেহা
পবন গেইলে মরা জীবন রে’

৬।

আস্ত একটা জীবন নিয়ে কী করে মানুষ! এই জিজ্ঞাসাই কি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মানুষকে! জীবন যাপন করতে করতে কি ক্লান্তি জমে! ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গিয়ে কী এক খোঁজ পীড়িত করতে থাকলে তখন তো আর পলায়ন ছাড়া কোন উপায় থাকে না। সেরকম এক উপায়হীনতা থেকে ফরেস্ট ফরেস্ট হেঁটে হেঁটে কুদ্দুস ও ইয়াসিন এক কুড়ি সাত বছর আগে চলে গিয়েছিল আসাম দেশের এক বাথানে। কিন্তু তাদের সর্বশরীরে মিশেই ছিল উত্তরের সব নাচ, সব গান, সব গানবাড়ি, রাতের পর রাতের সব গানপালার আসরগুলি। আর ছিল ধলা গীদাল। তার এত এত সময় ডিঙিয়ে আবার ফিরতে হল তাদের। আর এই ফেরাকে উৎসবের মর্যাদা দিতে মধ্য হাট থেকেই আজ ফিরতে হচ্ছে রাধাকান্ত আর কইকান্তকে। এসবের ভিতর সাজিয়ে রাখা থাকছে গানের পর গান—

‘ছাড়িয়া না যাইস রে
বুকে শ্যালো দিয়া
তুই সোনা ছাড়িয়া গেইলে
আদর করিবে কায় জীবন রে’...

৭।

এত এত হাট। চারপাশে ছড়ানো। যেন হাটের ভূগোল পরিধিতে হাটগঞ্জ হয়েই মিশে যাওয়া। উত্তরের অনাবিল সব ধুলোমাখা মানুষের যাপনের কী যেন মাদকভরা এক গন্ধ আছে, যার টান চুম্বকের মতন! নাসিরুদ্দিন ব্যাপারী গজেন বর্মণ বান্ধে ওরাও হীরামতি নার্জিনারী আব্রাহাম রাভা সব কেমন মিলেমিশে এক মহাসম্মেলনের ধরতাইটা পোক্ত করে ফেলে। আর ভাঙ্গা হাটের ভিতর আপনমনে চলতে থাকে বুঝি আত্মপরিচয়ের শেকড় খোঁজার আপ্রাণ প্রয়াস! আর তপ্ত দুপুরে, হাটের জামাত থেকে কারা যেন গুনগুন গাইতে থাকে গান,

‘ওরে হাটের মধ্যে শামুকতলা
হালুয়া গরুর নাগছে মেলা
ছেউটি গরুর ও রে নেখায় জোকায় নাই
মেচ গারো সাঁওতাল
নাগেয়া দিল কাউটাল
এগিলা কথা মোটেও বোঝে না’

এভাবেই তো কালখন্ডগুলিকে কালানুক্রমের ভেতরে কেবল ঢুকে পড়তে হয়। অথচ কোথাও

জায়মানতা থাকে কি? নদী টপকে চলে যাওয়া থাকে কি?

৮।

উত্তরকথা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসলে শেষ বলে কিছু হয় না। গল্প কখনও ফুরোয় না। সমাপ্তি থেকে আবার জেগে ওঠে। এটাই আবহমানের ইতিহাস। তো আমরা দেখি, রাধাকান্ত ও কইকান্ত হন্তদন্ত মরিচহাটির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আকাশের মেঘ থরে থরে সাজানো এক বিভ্রম মেলে দিয়ে তাদের বুঝি গোপন এক ভুলভুলাইয়ার ফাঁদে ফেলে দিতে চাইছে। কোথাও হরিবাড়ি থাকে। কীর্তনের আসরে মনোশিক্ষার গানে গানে জীবন ভরিয়ে নেওয়ার অবকাশ থাকে। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে জীবনকেই জীবনযাপনের ব্যাপ্ততায় লীন করে দেওয়াই বুঝিবা। এখানেই তো মানুষের জয়! মানুষ তো বুঝতে পারে, শেষাবধি—

‘একবার হরি বল মন রসনা
মানব দেহাটার গইরব কৈর না
মানব দেহা ভাই মাটির ভান্ড
পড়িলে হবে রে খন্ড খন্ড
ভাঙ্গিলে দেহা আর জোড়া নেবে না’।

রাধাকান্ত আর কইকান্তর চোখে জলের ধারা। কোথায় পড়ে থাকে টাকাপয়সা! ধান পাট তামাকের হিসাব কিতাব। তারা পরস্পরকে আমূল জড়িয়ে ধরে আর কান্নার দমকে দমকে কাঁপতে থাকে। আর, গানবাড়ির থেকে রাতের কালোর দিকে ছুটে চলে গান—

‘দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দালানের মাটি
ও গোসাইজি, কোন রঙ্গে’...

৯।

জীবন অনন্ত। জীবন বহমান। নদিটদি মেঘ হাওয়া গাননাচের বহুস্বরিক ক্যানভাসে সব আঁকা থাকে। সোমেশ্বরীর পাকঘর থেকে মুসুরির ডালের গন্ধ আর প্রাচীনা আবোর মজা গুয়ার মিশ্রণে উত্তরের বিলপুকুরের হাঁসগুলি তাদের চলাচলের ভেতর দিয়ে আবহমানের সব গল্পকথকতাগুলিকেই হাহাকারের মতন সাজিয়ে দিতে থাকে, সাজিয়ে দিতে থাকে, একধরণের বাধ্যতায়ই হয়তো উত্তরকথার খুব খুব ভেতরেই। তখন খুব মনে পড়ে যায়, জলে গা ডোবানো সারি সারি মহিষদের কথা, মইষাল বন্ধুর গানের কথা—

‘মইষ চড়ান মোর মইষাল বন্ধুরে
কোন বা চরের মাঝে
এল্যা কেনে তোর ঘান্টির বাইজন
না শোনং মুই কানে’

তখন উত্তরের হাওয়ায় হাওয়ায় নূতন করেই বুঝি উত্তরকথা রচিত হতে থাকে।

‘এখন ডুয়ার্স’
দ্বারা প্রকাশিত সবরকম
বই পাওয়ার ঠিকানা
শিবমন্দির

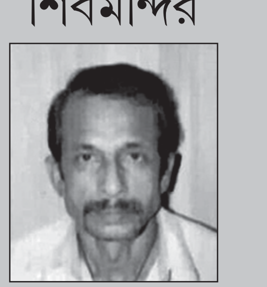

অনুপ কুমার দাস
৯৫৬৪৯৯৮৫৬১

আমি খুঁজে ফিরি হাতিপোতার সোনালি দিনগুলি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই কর্তা-গিন্নি দু'জনকে এক নৌকায়, একসঙ্গে ট্রেনে, বাসে উড়োজাহাজে উড়ে যেতেই হবে কিংবা হবে না। সত্য আসলে পরিস্থিতি, বয়স, ঢিলেঢালা নাটবল্টু, রোগ ব্যধি, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, মরণ-বাঁচন কত কী উটকো চিন্তা বলুন তো। বলে— 'বাবাজি এখন খ্যামা দাও। অনেক চরকি পাক দিয়েছ, এবারে থামো। উপদেশ শুনতে শুনতে পাগল। যত বলি বেড়ানো এক প্রকার ব্যারাম। এর কোনও নিদান নেই। বিছানায় পড়লেই লেজেগোবরে হয়ে পড়বে। তার চেয়ে লেংড়িয়ে মেংড়িয়ে চলো যাই বাইরে। আড়ালে অনেকে মুখ টিপে বলে জানি তোমার বেড়ানো মানে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। গৃহিনী, সহধর্মিনী, স্ত্রী যাই বলুন তিনি যদি ভ্রমণে বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয় তাহলে সমস্যা। তা হোক মসজিদ ক'জন দেখে বা দেখার ইচ্ছে করে বলুন তো। আলিপুরদুয়ারের কাছে বনচুকামারির পুরাতন মসজিদ কিংবা শামুকতলার কাছে মজিদবাড়ি। পুরাতত্ত্বের শেকড়বাকড় জড়িয়ে আছে। হনললু ব্যাঙ্কক দেখার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দের। আর মজিদবাড়ির দইয়ের সুখ্যাতি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত।

দু'জনে ডুয়ার্সের চা-বাগানে, জঙ্গল, গ্রামগঞ্জ, হাট, চেনা-অচেনা মাঠে ময়দানে কম পরিক্রমা হয় নাই। শৈশবের বন্ধু নন্তু এখন কোথায় আছে কিছুই জানি না। পূর্ব ডুয়ার্সের ধুমপাড়া যার পোশাকি নাম নিউল্যান্ডস চা-বাগান, সেখানে ফিটারবাবু পদে যুক্ত ছিল। অদ্ভুতভাবে যোগাযোগ হয়ে যায়। ট্রু টেল দ্যাট ইজ স্টেঞ্জার দ্যান ফিকশন, গল্পের মত। আমি আর রাজেন পান্ডে রওনা হয়েছি পায়ে পায়ে নিউল্যান্ডস থেকে সঙ্কোশ কালীখোলা হয়ে যমদুয়ারে বেড়াতে যাব। গিন্নি খেপচুরিয়াস। শেষ পর্যন্ত যমদুয়ার। বেড়ানোর আর জায়গা খুঁজে পেলে না? জগন্নাথদা একটা চিরকুট বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'চিন্তা নেই। বদরীদাস আছে ধুমচিপাড়ায়। কেরোসিন তেলের ডিলার। সে আপনাদের থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

বারোবিশা থেকে সাবারি জিপে।

বাস থেকে নেমে বদরীবাবুর ডেরা খুঁজছি হঠাৎ শুনি— কী রে গৌরী তুই এখানে? কী ব্যাপার? ভূত দেখছি না তো?

—আরে নন্তু যে!

বুকে জড়িয়ে ধরে। ভাল নাম অনুপ সেনগুপ্ত। আমি থাকতে তুই যাবি বদরীর বাড়ি। মাথা-টাথা খারাপ?

পান্ডেবাবু এক খিলি পান মুখে দিয়ে বলে— চমৎকার নাটক। অদ্ভুত যোগাযোগ। কিন্তু সঙ্গে তো আরেকজন।

—যদি হই সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন।

আর কী নন্তুর পাল্লায় পড়েছি! বারান্দায় নন্তুর স্ত্রী দাঁড়ানো।

—দেখো কাণ্ড! আমার ন্যাংটা কালের বন্ধু গৌরীশঙ্কর। নন্তু বলে— বউকে সঙ্গে আনতে পারতিস।

—পারতাম। সব কিছু ভন্ডুল করে দিত। আর এতটা পথ তিনি পাদমেকং ন গচ্ছামি। তাছাড়া পথে নারী বিবর্জিতা।

নন্তু বলে— সব ফালতু কথা।

যাইহোক শেষ রাতে চা-বাগানের পথ ধরে চরৈবেতি। কত বছর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন মালদহের এডিএম সঞ্জীব বলে— আপনার কথা নন্তুদা খুব বলে। ক্যায়া থা জমানা। বিলকুল বদল গায়া। সঞ্জীব নন্তুর ফোন নম্বর দিয়েছিল। কিন্তু হারিয়ে ফেলি। শুনেছি জলপাইগুড়িতে আছে। শিলিগুড়িতে আদি বাড়ি। যোগাযোগ একেবারে নাই। তারপর নন্তুর

জংবাহাদুরের দোকান

কোয়ার্টারে একযোগে গেছি। কখনও আমি একা থেকেছি। বেড়াতে গিয়ে পাগলার হাট, চ্যাংমারির কার্জীবাবুর বাড়ি। আর খোকন, বারবিশার জ্যোতির্ময় দে-র সঙ্গে দল বেঁধে কালীখোলা বেড়ানো। স্মৃতির অতল তলে। নিউল্যান্ডস আসা ময়নাবাড়ি থেকে হাতিপোতা। সঙ্গী মুকুল রক্ষিত। নদী জঙ্গল বসতি, চা-বাগানের মধ্য দিয়ে। জয়ন্তীর শেখরের আবিষ্কার ভাবনাঘাট পেরিয়ে।

সস্ত্রীক হাতিপোতায় যাই মুকুলদার বারংবার তাগাদায়। 'গৌরীবাবু একবার বউদিরে লইয়া হাতিপোতায় বেড়াইয়া যাইবেন।' গিন্নিকে বললাম, 'চলো হাতিপোতায়। বড় ভাল লাগবে। অকৃতদার মুকুলদা। ভীষণ অতিথিপরায়ণ। হাতিপোতা থেকে হাত বাড়ালেই জঙ্গল, চা-বাগান, ভুটানঘাট, চুনিয়াঝোরা। ফাসখাওয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব। আলিপুরদুয়ার থেকে লম্বা বাসে চাপরের পাড়, সলসলাবাড়ি, যশোভাঙা, শামুকতলা, ডাঙ্গী, ধওলা, কোহিনুর, কার্তিক, তুরতুরি, ময়নাবাড়ি ছুঁয়ে হাতিপোতা হাটতলায়। বাস থেকে নামতেই দেখি মুকুলদা দাঁড়ানো। —আরে কী কাণ্ড দ্যাখেন, আপনারা আইতাছেন অনেকে জাইনা গেছে। পোস্টমাস্টার তাপস, মোদকবাবু, বসুমাতারী, মার্শাল খাখা, জয়ন্তীর ছবি, তাউজি। কী কাণ্ড! এমন ঢাকঢোল বাজিয়ে দেওয়া। কোন ছাতার সেলিব্রেটির আগমন ঘটল।

টিনের ঘটঘটি গেট। মাথার উপর গরুর গলঘণ্টা ঝোলানো। ওটাই কলিং বেল। পাশে তাওজির দোকান। ওখানেই খবরের কাগজ আসে। হেলে পড়া ছাপরা তালিতাপ্পা মারা লজঝর কাঠের বেড়া দেওয়া ঘর দেখে গিন্নি ভীষণ মনমরা, যেন চুপসে গেল। মেঝে কাঠের। অগনিত ফাঁকফোকর। বিদ্যুৎ নেই। কুপি না হলে লম্প বা হ্যারিকেন। পেছন দিকে খোলা। রহিমাবাদ চা-বাগান। কুয়াতলা শুকনো পাতায় ঢাকা।

—বউদি বুঝলেন, গৌরীবাবুর ভাষায় বাইদ্যার ঠেক। বলেন বড় শান্তির জায়গা। সন্ধেবেলা তক্ষকের কোরাস, ভামেদের খচরমচর, ছুঁচোদের ছোটাছুটি, কীটপতঙ্গের পরম আশ্রয়স্থল।

—আমরা কি এখানেই থাকব?

—কী যে কন? আপনাদের জন্য ব্যবস্থা কইরা রাখছি। সঞ্জীবদের বাড়িতে। কাঠের দোতালায়। এত টেনশন কইরেন না। গৌরীদা ময়মনসিংহের পুলা। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল। চলেন যাই জংবাহাদুরের দোকানে।

ভোর হতে না হতেই জংবাহাদুরের দোকানের ঝাঁপ খুলে যায়। দিনভর আড্ডা। হাতিপোতা থাকার সময় জংবাহাদুর, যতন, বাদল না হলে কারুর বাড়িতে নেমতন্ন আপনা থেকে জুটে যেত। নারায়ণ, সঞ্জীব, রণজিৎ, নন্দপ্রসাদ, ডাক্তারবাবু, লোকজন। বসুধৈব কুটুম্বকম। হাতিপোতা থেকে আমি ও পান্ডে পায়ে পায়ে অরণ্য পথে ভুটানঘাট হয়ে পিপিং ভুটান বেড়াতে যাই বহু বছর আগে। কয়েক দশক আগের স্মৃতিকথন। সেই জঙ্গল কোথায়? বনবাংলো ভস্মীভূত। অভিমানে রায়ডাক নদী সরে গেছে। নন্দপ্রসাদ এখন স্থায়ীভাবে হাতিপোতায় থাকে। হাতিপোতার ইতিকথা লম্বা স্মৃতিচারণ শেষ হবার নয়। যদি মনপ্রাণ ঢেলে লিখতে পারতাম কলমের জোর থাকত হয়ত পাঠকদের কাছে পৌছানো যেত।

সস্ত্রীক হাতিপোতায় যাওয়া অষ্টমী পুজোর দিন দিলু গাঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে। যাবার পথে শ্রীনাথপুর চা-বাগানের কিছুটা সময় কাটান। খিচুড়ি ভোগ খাওয়া। সঙ্গে গাড়ি ছিল। আমরা ভুটিয়াবস্তি হয়ে জয়ন্তী নদীর ওপর ভগ্ন সেতু, রায়বাবুদের জরাজীর্ণ কাঠের দোতলা বাড়ি হয়ে ফিরে আসি। হাবিজাবি হিজিবিজি করে সময় ফুরিয়ে গেল। দুঃখ তো হয় পরম প্রিয় মুকুলদার মৃত্যুর পর হাতিপোতার সঙ্গে সম্পর্ক সত্যি ক্ষীণ হয়ে আসে। শেষ যাওয়া এবং রাত্রি যাপন জয়ন্তী চা-বাগানে ছবিদের কোয়ার্টারে। যাবার পথে কিছুটা সময় সেই ছাপরা ঘরে চুপচাপ মাথা নীচু করে বসেছিলাম। বুক ঠেলে কান্না আসছিল। রণজিৎ বলে— কাকু কেন অকারণ কষ্ট পাচ্ছেন। যখন মন চাইবে, ইচ্ছে করবে আমাদের কাছে চলে আসবেন। উত্তমের স্কুটারের পেছনে বসে জয়ন্তী চা-বাগানে যাই। মনে পড়ে আমি আর মুকুলদা কতবার জয়ন্তী আর হাতিপোতায় বেড়াতে গেছি। হাতিপোতা গেলে মুকুলদার সঙ্গে বিকেলবেলায় হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে যেতাম ১২নং কম্পার্টমেন্ট। এখন সেখানে বনবাংলো তৈরি হয়েছে। কাঠের নয় কংক্রিটের।

হাতিপোতাতেই আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টার তাপসের সঙ্গে। বড় ভাল ছেলে। এখন ওরও বয়স হয়েছে। তো তাপস একদিন বলে, 'গৌরীদা একবার আসুন আমাদের মহাকালগুড়ি টিপে। বউদিকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসবেন। বললাম— শিয়ালকে ভাঙা বেড়া যখন দেখালে এবং যা সুন্দর বর্ণনা দিলে কথা দিলাম ছুটি ম্যানেজ করে দু'জনেই চলে আসব।

—সত্যি?

—বিলক্ষণ।

আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে চেপে শামুকতলা তারপর রিকশা, সান্তালপুর, ধারসি নদী, ছিপ্রা বিট ছুঁয়ে চমৎকার প্রাচীন চালচিত্র দেখতে দেখতে অচেনার আনন্দে ডানা মেলে যেন উড়ে চলা। একজন চলতি পথিককে জিজ্ঞাসা করি তাপস অধিকারীর বাড়ির হদিস।

—ওই যে দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে। রাস্তা থেকে গড়গড়িয়ে কিছুটা গেলেই দেখি মিত্রা, রিমঝিম, বৃষ্টি গেটের কাছে। ভিতরে নিয়ে বসতে দিল। যথারীতি আপ্যায়ন, নানা বাক্য বিন্যাস। কিছুই আর মনে নেই। কিন্তু মনে পড়ে তাপসের শ্বশুরবাড়ি, নিজের বাড়ির কাছেই। মনে হচ্ছিল পথের পাঁচালির গ্রামে বেড়াতে এসেছি। কী সুন্দর মায়াভরা সবুজে সবুজ। তাপসের ঘরের পেছনে কত ধরনের গাছপালা। আমরা হেঁটে দেখাসাক্ষাৎ সেরে ফিরে এসে দেখি তাপস চলে এসেছে। সন্ধ্যাও নেমেছে।

—গৌরীদা খুউব খুশি হয়েছি বউদিকে সঙ্গে করে আনাতে। আপনি তো একা একা ঘোরেন। মাঝে মাঝে বউদিকে সঙ্গে নেবেন। আগামীকাল মুকুলদা, ডাক্তারবাবু আসবেন।

মহাকালগুড়ি টিপ পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে অনায়াসে গড়ে তোলা যায়। বিশেষ করে ছিপ্রা জঙ্গল, মেচ, রাভাদের সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি হওয়া। ঝোলনা সাঁকো পার করে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে মুকুলদা, ডাক্তারবাবু, তাপস এবং আমি পৌঁছে গেছিলাম নারারথলি জলাশয়ে। দারুণ সুন্দর মনকাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ করা জায়গা। নারারথলি নজরমিনারটা সে সময় দেখভালের অভাবে সিঁড়ির কাঠ চুরি হয়ে যাচ্ছিল। বনমন্ত্রী যোগেশবাবুকে বলেছিলাম একটু দেখুন। উনি বলেছিলেন অবশ্যই দেখব। ফেরার সময় বেগুন খেতের ভিতরে ঢুকি। এখানে ওখানে বাড়িঘর। মাঝে মাঝে মহাকালবাবারা চুপিচুপি এসে বেগুন সাবাড় করে। সন্ধের আগে মুকুলদা চলে যান হাতিপোতায়। তাপসের স্ত্রী আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেল গম্ভীর নার্জিনারীর বাড়িতে। ওনার স্ত্রী সুরাইয়ার মেচ গান শুনি, নাচ দেখি। গল্পগুজব, অনেক কিছু খেয়ে গল্প করতে করতে ফিরে আসি মহাকালগুড়ি টিপে।

আবার বেড়াতে যাওয়া দু'জনে এবং সেবারে গাড়ি ভাড়া করে বেড়ানো হল রসিকবিল পাখিরালয়ে। তারপর সুদীর্ঘ নীরবতা। জানতে পারলাম তাপস সান্তালপুরের ডাকঘরে। পুনশ্চ যোগাযোগ ক্ষণিকের মতন ঝিলিক আধুনিক মাধ্যম ফেসবুক। কথা নেই শুধু নীরবে চেয়ে থাকা, গল্প, ভিডিও কল। সব ঠিক আছে কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় সেই চিঠির যুগটাই ভাল ছিল। মানুষ এখন বড্ড বেশি একা, নিঃসঙ্গ, চুপচাপ। ভাল লাগে না। আমি খুঁজে মরি হারানো অতীত। হাতিপোতার স্বর্ণঝরা দিনগুলি। সেই বাইদ্যার ছাপরাঘর। জানি না আগের মত আছে কিনা।

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ৩

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

হস্তিনাপুরে শেষাবধি মাছের ঝোল রান্না করে ফেলল ভুসুকু। কিন্তু কিন্তু গন্ধে গন্ধে সংবাদ পৌঁছল হস্তিনাপুরের রাজকীয় পাকশালে। ভীমসেনের জন্য মাছ আর ঝোল। সেই অপূর্ব, দেবভোগ্য খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে ভীমসেন মুগ্ধ। এরপর যে ভুসুকুর সন্ধানে লোক যাবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভুসুকুকে পাওয়া গেল না। সে জানি কোথায় গেছে! কোথায়? সত্যিই কি দেশের বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে সে?

৯

বিদেশি পাড়ায় ভুসুকু কখনো আসে নি। কিন্তু এখানে যে তাঁর দেশের লোক এসে উঠবে না, সেটা সে জানত। অশ্বারোহী তাঁর অপরিচিত। সাতপাঁচ না ভেবেই ভুসুকু উঠে পড়েছিল ঘোড়ায়। বিরাট চেহারার কালো ঘোড়াটা অনায়াসে দু'জনকে পিঠে নিয়ে হস্তিনাপুরের পাথর বাঁধান পথ বেয়ে টকাটক শব্দ তুলে ছুটছিল। ভুসুকু নিশ্চিত ছিল যে তাঁরা রাজ অতিথিশালার দিকেই যাচ্ছে। অশ্বারোহী হঠাৎ ভিন্ন পথ ধরলেন।

'এ পথ তো অতিথিশালর দিকে যাচ্ছে না মহাশয়?' ভুসুকু জানান দিয়েছিল। সামনে বসে থাকা লোকটার মুখ দেখার উপায় ছিল না। ভুসুকুর মনে হল যে অশ্বচালক কথাটা শুনতে পায় নি।

'মহাশয় শুনছেন?'

'আমরা অতিথিশালার দিকে যাচ্ছি না। আপনার দেশের লোকজন অন্যত্র উঠেছেন।'

ভুসুকু অবাক হল। এমন হওয়ার কথা নয়। অসুরদের হস্তিনাপুর বিদেশি বলে মনে করে না। তা হলে কি দেশভ্রাতারা কোন মহল ভাড়া করে আছেন? সেক্ষেত্রে অনেক খরচ। অহেতুক কেন দেশভাই-এর মুদ্রা ব্যয় করবেন?

'তাঁরা কোথায় উঠেছেন মহাশয়?'

'সামনেই।'

ভুসুকু লক্ষ্য করল ঘোড়ার গতি বেড়ে যাচ্ছে। পথ একটু ফাঁকা পেয়ে ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করেছে। ভুসুকু আর কিছু না বলে শক্ত করে অশ্বচালকের কোমর জড়িয়ে ধরল। একটু পরে ঘোড়া ঢুকে পড়ল বিদেশি পাড়ায়। ভুসুকুর একবার মনে হল যে কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর দেশভ্রাতারা বিদেশি পাড়ায় এসে উঠেছে। হতে পারে তাঁর কোনও বিদেশির অতিথি হয়েছেন।

চওড়া রাস্তার দু'পাশে চমৎকার সব বাড়ি। সামনে উদ্যান। পুষ্করিণী। কিন্তু অশ্বচালক যে বাড়ির সামনে এসে থামলেন, তা উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। ভুসুকু দেখল প্রাচীরের গায়ে একটি মাত্র দরজা। সেটা বেশি বড়ো নয়। একটি রথ প্রবেশ করতে পারবে। দরজা বন্ধ ছিল। অশ্বচালক ঘোড়া থেকে নেমে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বিচিত্র একটি ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। একটু পরে দরজা খুলে গেল।

ভেতরে চওড়া উঠোন। একপাশে দ্বিতল ভবন একটি। সেটা বেশ বড়ো। প্রতি তলে সাত-আটটি করে কক্ষ রয়েছে বলে মনে হল ভুসুকুর। উঠোনের আরেক পাশে একটি ছোট বাড়ি চোখে পড়ল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন। প্রত্যেকের চেহার বেশ শক্তিশালী এবং হাতে তাঁদের খোলা তরোয়াল। দু-জন ধনুর্ধরও চোখে পড়ল ভুসুকুর।

যে দরজা খুলে দিয়েছিল, তাঁর চেহারাও দশাশই। সে ঘোড়ায় বসা ভুসুকুর দিকে একবার তাকিয়ে অশ্বচালকের সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বাক্যবিনিময় করে আবার তাকাল। তারপর হস্তিনাপুরের চলতি ভাষায় বলল, 'দয়া করে নেমে আসুন। আপনার কক্ষ দ্বিতলে।'

'দেশভ্রাতারা কি দ্বিতলেই আছেন?'

'কেউ নেই মহাশয়।' লোকটি মোলায়েম হাসল। ভুসুকু ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। সে একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'নেই মানে? আপনার কথা রহস্যময় শোনাচ্ছে!'

'আগে আপনি কক্ষে গিয়ে আহারাদি সেরে বিশ্রাম নিন। তারপর মহাশক্তিমান ধূর্জটিবর্মা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'আপনারা পরিসহাস করছেন?' ভুসুকু এবার একটু রেগে গেল। 'আমাকে এখানে এভাবে ডেকে আনার কারণ কী? আমি এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করতে চাই। দরজা খুলুন।'

'এখানে যাদের হাতে তরোয়াল দেখছেন তাঁদের বীরত্ব আর ক্ষমতার বিষয়ে আপনি অজ্ঞ।' লোকটি তাঁর মোলায়েম হাসি ধরে রেখেই বলল। 'সুতরাং ভেবে নিন যে আপনি এখন থেকে আমাদের সম্মানিত বন্দি।'

'আমাকে বন্দি করেছেন আপনারা?' ভুসুকু হেসে ফেলে। 'আমি কী করেছি?'

'দয়া করে কক্ষে যান। মহাশক্তিমান এলে তাঁর কাছেই শুনবেন। তবে, আপনার হেঁটে যেতে আপত্তি থাকলে যে কেউ আপনাকে কাঁধে তুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।'

'প্রয়োজন নেই। পথ দেখান।'

ভুসুকু একটু হতভম্বের মত একজনকে অনুসরণ করে দোতলায় নিজের কক্ষে পৌঁছল। সে কক্ষ অসাধারণ! রাজতুল্য ব্যক্তিদের বাস করার উপযোগী। তাঁর পরিচর্যা করার জন্য করার জন্য দু'জন ভৃত্য অপেক্ষা করছিল। আপ্যায়ণের কোনও ত্রুটি থাকল না। ভুসুকু খেয়ে দেয়ে অদ্ভুত নরম বিছানায় চিৎ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, কী ঘটছে জানি না! এখন তো রাজার মত থাকি!

কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল সে ভাবতে ভাবতে। তন্দ্রা ছুটতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে সে লক্ষ্য করল একজন ভৃত্য অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। ভুসুকুকে উঠে বসতে দেখে সে বলল, 'মহাশক্তিমান বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি নিদ্রা গেছেন দেখে ডাকতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি কি এখন ভেতরে আসবেন?'

'অবশ্যই!' ভুসুকু বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দেখল একজন দীর্ঘদেহী পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করছেন। তাঁর চুলের রঙ লাল। এমন মানুষ ভুসুকু আগে কখনও দেখে নি। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'আমার নাম পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা।' গমগমে গলায় বললেন। 'আপনাকে আমাদের মধ্যে স্বাগত!'

'সুখি হলাম।' ভুসুকু বিস্ময় কাটিয়ে ধূর্জটিবর্মাকে একটি আসন দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল। তিনি বসলেন। ভুসুকু একটি ছোট আসন টেনে নিয়ে তাঁর মুখোমুখি, একটু দূরত্ব রেখে, বসে বলল, 'আপনার আতিথেয়তা অপূর্ব। কিন্তু আমাকে এখানে বন্দি করে আনা হয়েছে। এর কারণ জানতে পারলে আরও সুখি হতাম।'

ধূর্জটিবর্মা স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন ভুসুকুর দিকে। সে চোখে অবশ্য রাগ নেই। দৃষ্টি প্রশান্ত।

'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন।' একটু পরে তিনি বললেন। 'আর্য শব্দটা কি আপনি হস্তিনাপুরে আসার আগে কোথায় শুনেছিলেন?'

ভুসুকু অবাক হয়ে বলল, 'তা শুনিনি। কিন্তু এর সঙ্গে আমাকে বন্দি—।'

'আর্য শব্দের অর্থ কী?'

ধূর্জটিবর্মার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ভুসুকু বুঝতে পারল যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। সে বলল, 'হস্তিনাপুরের শাসকরা নিজেদের কৃষক বলতে ভালবাসেন। আর্য অর্থে সেটাই বোঝায়।'

'কিন্তু আমরা এদের বলি পশ্চিমা। বহুকাল আগে এদের পূর্বপুরুষ সিন্ধুদেশ ধ্বংস করে এদিকে প্রবেশ করেছিল। এরা এসেছিল সিন্ধুদেশের পশ্চিম দিক থেকে। তারপর এদিকে এসে গঙ্গা নদীর দু'পাশ ধরে বসবাস শুরু করে। গোড়ায় অসুরদের সঙ্গে এদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে। তারপর সন্ধি হয়। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে একদিন অসুরেরাই জয়লাভ করত। আমরা সেটার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু শেষে সন্ধি হওয়ায় বুঝলাম পশ্চিমাদের বিনাশ করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। পশ্চিমাদের যতগুলি রাজ্য আছে, তারমধ্যে সেরা হল হস্তিনাপুর। একে ধ্বংস করার জন্য আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।'

'আপনি কি পাগল?' উত্তেজনায় ভুসুকু দাঁড়িয়ে পড়ল। ধূর্জটিবর্মা মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'আর্যদের বেদ শুনেছেন? তার কবিতাগুলি কেমন লাগে আপনার?'

ভুসুকু বসে পড়ে বলল, 'ভাল।'

'কতটা ভাল?'

'অতি উত্তম। একসঙ্গে যখন কবিতাগুলি টানা টানা সুরে মন্থর ছন্দে আবৃত্তি করে তখন অপূর্ব বোধ হয়। আপনি নিশ্চই স্বীকার করবেন যে তাঁদের ভাষা অসাধারণ!'

'আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন মহাশয়!' ধূর্জটিবর্মা সামান্য হাসলেন। 'স্বীকার করি তাঁদের ভাষা অতুলনীয়। সে ভাষার মূর্ছনায় আপনি ভুলে গেছেন যে ওই কবিতাগুলি আসলে আপনাদের কৃষিমন্ত্রের অনুবাদ মাত্র। মন্ত্রগুলি বহুযুগ আগে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা রচনা করেছিলেন। আপনিও যে একজন অসুর তা নিশ্চই ভুলে যান নি?'

'তাই?' ভুসুকু অবাক হয়। 'আমি বৈদিক ভাষা জানি না। ভূতমিত্রের শিষ্যরা সমবেত স্বরে কবিতাগুলি পাঠ করে। সেখানেই প্রথম শুনি। তারপর একদিন একটি যজ্ঞানুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম ভূতমিত্রের সঙ্গে। সেখানে বীণাধ্বনির সঙ্গে কবিতাগুলি পড়া হচ্ছিল। শুনে অভিভূত হয়ে পড়ি। কিন্তু কবিতাগুলির মূল ভাবনা যে আসুরিক, তা জানতাম না।'

'একদিন এই ভাষায় যা লেখা হবে সেটাকেই লোকে সত্যি বলে মানবে ভুসুকু! এই ভাষাই হল পশ্চিমাদের সেরা অস্ত্র। কিন্তু ওরা ধ্বংস হলে ভাষাও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'ক্ষমা করবেন? আপনি কি হস্তিনাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার স্বপ্ন দেখছেন?' ভুসুকু একটু বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল। 'আপনার হাতে কত সৈন্য আছে?'

'যুদ্ধ কি শুধু তির-ধনুক-গদা-ভল্ল দিয়ে হয়?' ধূর্জটিবর্মা স্থির চোখে তাকালেন। 'আমার সৈন্যরা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর কিন্তু সংখ্যায় অতি নগণ্য। আমি যে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব তার নাম বিভাজন। আমি যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের মধ্যে বিভেদ ঘটাব। হস্তিনাপুরে গৃহযুদ্ধ হবে। এতেই শেষ হয়ে যাবে ওরা।'

'উত্তম! আপনি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করুন। আমার এখানে কোনও ভূমিকা নেই। আমাকে আশ্রমে ফিরে

ভুসুকু একটু বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল। 'আপনার হাতে কত সৈন্য আছে?' 'যুদ্ধ কি শুধু তির-ধনুক-গদা-ভল্ল দিয়ে হয়?' ধূর্জটিবর্মা স্থির চোখে তাকালেন। 'আমার সৈন্যরা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর কিন্তু সংখ্যায় অতি নগণ্য। আমি যে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব তার নাম বিভাজন। আমি যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের মধ্যে বিভেদ ঘটাব। হস্তিনাপুরে গৃহযুদ্ধ হবে। এতেই শেষ হয়ে যাবে ওরা।'

যেতে দিলে ধন্য হই।'

'আপনাকে ছেড়ে দিলে সবাই জেনে যাবে। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে হস্তিনাপুরের সেনা আমাদের ধরতে আসবে। আমরা তখন পালাতে বাধ্য হব।'

'তার মানে?'

ধূর্জটিবর্মা তখনই উত্তর না দিয়ে আসন ত্যাগ করলেন। কোমরবন্ধে ঝোলান তরোয়ালটা ঠিক করে, ঠান্ডা গলায়, ভুসুকুর কানের কাছে মুখ এনে, কেটে কেটে বললেন, 'আপনাকে আজ রাতে অন্য কোথাও নিয়ে যাব। সেখানে আরামেই থাকবেন। কিন্তু এক মাস সময় পাবেন। তারপর আপনাকে হত্যা করব।'

ধূর্জটিবর্মা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। ভুসুকু ধপাস করে বিছানায় পড়ে চিৎ হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, 'ধুত্তোরি!'

১০

হস্তিনাপুর নগরে যে সব অসুর বসবাস করেন তাঁদের বেশির ভাগ থাকে রাজমহলে। নগরের এক প্রান্তে থাকা রাজমহল একটা ছোটখাট নগর বিশেষ। অসুর দেশের দূতাবাস ছাড়াও সেখানে রয়েছে চমৎকার সব মহল, কৃষি বিদ্যালয়, হস্তি বিপণি, লৌহবিদ্যা শেখার পাঠশালা। পথঘাট প্রশস্ত, গাছপালা, ফুলফলে সাজান। দিবা দ্বিপ্রহরে রাজমহল রীতিমত কর্মচঞ্চল। হস্তিনাপুরের প্রধান সান্ত্রী বীরভদ্র একটি রথে চেপে রাজমহলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গন্তব্য কামরূপের দূতাবাস। হস্তি বিপণির ঠিক পাশেই কামরূপের রাজদূতের আবাস। সেই অতিকায় মহলের সামনে বীরভদ্রের রথ থামল। তাঁর পরিচয় পেয়ে দ্বাররক্ষী সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

মূল মহলের সামনে চমৎকার উদ্যান। গঙ্গার হাওয়ায় সে উদ্যানের পরিবেশ মনোরম। রাজদূত মহাবলী সেই উদ্যানে, গাছের ছায়ায় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন। বীরভদ্রের পরিচয় পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কী সৌভাগ্য! নিয়ম অনুসারে আপনি বার্তা পাঠালেই তো আমি আপনার করণে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য ছিলাম। নিশ্চই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণে আপনি নিজেই চলে এসেছেন?'

'আমি একটু একান্তে কথা বলতে চাই রাজদূত মহাবলী!' বীরভদ্র বললেন।

'অবশ্যই! সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে মন্ত্রণা কক্ষে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অপেক্ষা করতে বলে মহাবলী মন্ত্রণাকক্ষের দিকে হাঁটা দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে বীরভদ্র এসে পৌঁছোলেন একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে। সেখানে আর কেউ ছিল না। আসন গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে মহাবলী জিজ্ঞাসু স্বরে বললেন, 'আমার কৌতূহল নিরসন করুন বীরভদ্র! কুরুরাজের সব কুশল তো?'

'আমি এসেছি যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের একটু অনুরোধ নিয়ে।' বীরভদ্র আসন গ্রহণ করলেন। 'অনুরোধটি ব্যক্তিগত। এরসঙ্গে কুরু সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলে ধন্য মনে করব। তিনি সততার প্রতীক। কোনও অসৎ অভিপ্রায়ে যে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তা হতেই পারে না। কিন্তু যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ রক্ষার জন্য তো লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়!'

'আপনাকে খুলে বলছি। বিষয়টি খুব রহস্যময় এবং সন্দেহজনক।'

'অতি উত্তম! রহস্য আমার খুব প্রিয়। স্বয়ং কামরূপরাজ অবধি রহস্য পছন্দ করেন।'

'তবে শুনুন! দিস্তং নদীর পাড়ের দেশ থেকে এক যুবক এসেছিলেন হস্তিনাপুর নগরে। সে দেশ কামরূপের অধীনে। সুতরাং সেই যুবক আপনাদের প্রজা। তিনদিন হল সেই যুবক নিরুদ্দেশ। কিন্তু আমার কাছে সংবাদ আছে যে সে যুবক সাগরদেশের দূতাবাসে বন্দী।'

'সে যুবকের নাম কি ভুসুকু?'

'আপনি জানেন তাঁর নাম?'

'অবাক হবেন না সান্ত্রীপ্রধান। কামরূপ থেকে যাঁরা এই নগরে আসেন তাঁদের অধিকাংশ বণিক। হাতি এবং হাতির দাঁতের জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসেন তাঁরা। কেবল হস্তিনাপুর ভ্রমণের জন্য খুব কম কামরূপীই আসেন। এর কারণ দূরত্ব। দূতাবাসের কর্মচারিরা ভ্রমণকারী কামরূপীদের সংবাদ রাখেন। ভুসুকু নামক ছেলেটি ঋষি ভূতমিত্রের আশ্রমে

মাহুতের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল বলে আমরা জানতাম। তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদও আমাদের জানা। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সে হয় তো দেশান্তরে গেছে, অথবা নিজের দেশে ফিরে গেছে।'

'তা ঘটে নি।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই। কারণ স্বয়ং যুবরাজ তাঁর সন্ধান করছেন। দ্বিতীয় পান্ডব তাঁর রান্না করা মাছের ঝোল খেয়ে আপ্লুত। অথচ সেই যুবক নিখোঁজ! তাঁকে ছলনাপূর্বক অপহরণ করা হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

'সাগরদেশের দূতাবাসে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছে বললেন! কিন্তু সেই ভুসুকুকে অপহরণ করে সেখানে বন্দি করে রাখার কারণ কী? কে তাঁকে অপহরণ করেছে?'

'একজন লালচুলের ব্যক্তির নাম উঠে আসছে। তাঁর নাম পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে তথ্য পেয়েছি। নিজের পরিচয় জানাতে তিনি বলেছিলেন, লঙ্কাদেশের নাগরিক।'

মহাবলী কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর একটু হতাশার সুরে বললেন, 'এ সবের অর্থ কী? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সাগরদেশের দূতাবাসে লোক পাঠিয়ে সন্ধান করা কি খুব অসম্ভব?'

'ভিনদেশের দূতাবাসে প্রবেশ করতে হলে কুরুরাজের অনুমতি চাই। কিন্তু যুবরাজ যুধিষ্ঠির তা চাইছেন না। তিনি গোটা ঘটনায় রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন। কারণ লঙ্কাদেশের নাগরিকদের চুল লাল হয় না। লঙ্কাদেশের সঙ্গে বহুকাল আমাদের কোনও সংযোগ নেই। বিভীষণের বংশধরেরা সে দেশ এখন শাসন করছেন, এটুকুই জানা আছে। যুবরাজের বিশ্বাস সেই লালচুলের ব্যক্তি, যাঁর নাম পুন্ডরীকাক্ষ, সে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে হস্তিনাপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয় তো ভুসুকুর মত একটি যুবককে তিনি অপহরণ করবেন কেন?'

'যুবরাজ ঠিক কী চাইছেন সান্ত্রীপ্রধান?'

'সাগরদেশ নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়েছে একটি অসুরদেশ নামে। যুবরাজ চাইছেন আপনি সে দেশের দূতাবাসে সাধ্যমত অনুসন্ধান করুন।'

মহাবলী হাসলেন। বললেন, 'ভুসুকু নামক যুবক কামরূপের প্রজা। আমাদের অবশ্যই নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। আশা করি এই অনুসন্ধান চাতুর্যের সঙ্গে করতে অনুরোধ করেছেন তিনি?'

'ঠিক তাই।'

'রহস্য আমি ভালবাসি আগেই বলেছি। কাজটি আমার কাছে বেশ উত্তেজক বলেও মনে হচ্ছে। বেশ। আমি কাল প্রভাতে নিজেই যাব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

বীরভদ্র বিদায় নিলেন। পরদিন ভোরবেলা কামরূপ রাজ্যের রাজদূত মহাবলী নিজের মহল থেকে একটি রথ নিয়ে যাত্রা করলেন সাগরদেশের দূতাবাসের দিকে। সেই দূতাবাসের সামনে দু'জন দ্বাররক্ষী তখন দাঁত মাজছিল। মহাবলী রথ থামিয়ে তাঁদের জিগ্যেস করলেন, 'সাগরদেশের আবাস এটা?'

দ্বাররক্ষীদের একজন উত্তর দিল, 'ঠিকই ধরেছেন মহাশয়। আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'কামরূপের নাম জানা আছে?'

'অসুর হয়ে কামরূপের নাম জানব না?' দ্বাররক্ষীটি তাঁর সহকর্মির দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। 'তা মহাশয় কি কামরূপের রাজা?'

'রাজা না হলেও রাজদূত তো বটেই!'

এবার রক্ষী দু'জন সোজা হয়ে অভিবাদন জানিয়ে চরম বিনয়ের সঙ্গে একবাক্যে বলল, 'অপরাধ নেবেন না মহাশয়! তবে দূতাবাসে কেউ থাকেন না। আমাদের মত কয়েকজন রক্ষী কেবল আছে।'

'আপনারা কি সবাই সাগরদেশের মানুষ?' মহাবলী ভাল করে দূতাবাসটি পর্যবেক্ষণ করতে করতে জিগ্যেস করলেন। 'দেশটি ঠিক কোথায় বলুন তো?'

'আজ্ঞে, ইয়ে মানে— আমরা ঠিক জানি না। সত্যি কথা বলতে কী— আমরা হস্তিনাপুরে এসেছিলাম কুরুরাজের সেনাবাহিনীতে যোগ দেব বলে। আমাদের দেশ হল মগধ। কুরুরাজের সেনাবিভাগ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল দূতাবাসে কাজ খালি আছে। যোগাযোগ করতে। আমরা এখানে যোগাযোগ করি।'

'ক'দিন হল কাজ করছেন আপনারা?'

'বছরখানেক হবে। তখন অবশ্য এখানে সাগরদেশের দূত ছিলেন। আরও কয়েকজন কর্মচারিও ছিলেন। তারপর তাঁরা কোথায় গেছেন জানি না। তবে মাসে মাসে বেতন পাচ্ছি যখন তখন অত জেনে আমাদের কাজ কী?'

'ঠিকই তো।' মহাবলী রথ থেকে নামলেন। 'তা বেতন তোমাদের কে দিচ্ছে ভাই? লালচুলের সেই লোকটা কি?'

রক্ষী দুটোর মুখ কাল হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'তিনিই দিচ্ছেন। এই দূতাবাসের দায়িত্বে তিনিই আছেন বলে জানি। তবে তিনি খুব একটা এখানে আসেন না।'

'এবার এলে তাঁকে বলো কামরূপের রাজদূত দেখা করতে বলেছেন। তিনি ছোট ছোট দেশের দূতাবাসগুলিকে একটি করে হাতি উপহার দিতে চান।'

এবার রক্ষী দুটির মুখে হাসি ফুটল।

১১

তিনদিন বন্দি অবস্থায় কাটানর পর ভুসুকু বুঝতে পারল যে করেই হ'ক পালাতে হবে। সেদিন রাতের বেলায় তাঁকে এনে রাখা হয়েছে চমৎকার এই দ্বিতল বাড়িটিতে। অবশ্য বাড়ির ভেতরে তাঁর হাঁটাচলায় কোনও বাধা নেই। জনা দশেক রক্ষী বাড়িটার পাহারায় আছে এবং কয়েকজন ভৃত্য আছে তাঁকে দেখেশুনে রাখার জন্য। ইচ্ছে হলে ভুসুকু ছাদেও যেতে পারে কিন্তু ঘরের বাইরে এসে প্রাঙ্গণে পা রাখার অনুমতি নেই। দ্বিতলের একটি ঘরের জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা করতে গেলে কোনও না কোনও রক্ষী কিংবা ভৃত্যের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভুসুকু তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাঁকে কেন বন্দি করা হয়েছে সেটা ধূর্জটিবর্মা নামক লাল চুলের লোকটা বলেছে বটে কিন্তু ভুসুকু ঠিকমত বুঝতে পারে নি। এক মাসের মধ্যে লালচুলের প্রস্তাবে রাজি না হলে কি তাঁকে বধ করে ফেলবে? ভুসুকুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

তবে যেটা ভেবে ভেবে ভুসুকু দিশা পাচ্ছে না তা হল, তাঁকেই কেন বেছে নিয়েছে লালচুল? হস্তিনাপুরে কি আর অসুর ছিল না? এটা একটা রহস্য! কিন্তু রহস্যের চেয়ে বড় বিষয় হল এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া।

সন্ধের পর থেকেই মেঘ ঘনিয়ে আসছিল আকাশে। একটু আগেই রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। খোলা জানালার পাশে বসে ভুসুকু টের পাচ্ছিল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সে প্রদীপটাকে আড়াল দেবে ভেবে উঠতেই কান ফাটান শব্দে কোথাও বজ্রপাত হল। ঘরটা সাদা আলোয় ভরে গেল পলকের জন্য। ভুসুকু ঘরের বাইরে এসে আকাশটা ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখল দণ্ডায়মান প্রহরী দুটোর মুখ শুকিয়ে গেছে।

তখনই আরেকটা বজ্রাঘাত হল কোথাও।

'অবস্থা ভাল নয়। এখানে বাজ পড়লে আগে দোতলায় পড়বে।'

'ব-বজ্রপাত ব্যাপারটা খুব খ্-খ্- খারাপ!' একজন রক্ষী কাঁপা কাঁপা গলায় জানাল। 'আপনি নি-নিচে চলুন!'

'প্রয়োজন নেই।' ভুসুকু গম্ভীর স্বরে বলল। 'আমাদের দেশে এমনটা প্রায়ই হয়। আমাদের মন্ত্র জানা আছে। তবে সেটা আমাকেই রক্ষা করবে। আমাকে শুধু পালঙ্কের নিচে ঢুকে থাকতে হবে।'

'ক্-কেন?'

'ওটাই নিয়ম। মাথার ওপরে কাঠ থাকলে মন্ত্র সে কাঠে বজ্রকে আটকে দেবে। আসলে বাড়িটা উত্তরমুখো বলেই বিপদটা বেশি।'

'তাই বুঝি?'

'ইন্দ্রদেব তো সেদিক থেকেই বজ্র নিক্ষেপ করেন— ।'

ভুসুকুর কথা শেষ হওয়ার আগেই চোখ ধাঁধান সাদা আলো আর পিলে চমকানি শব্দ ছড়িয়ে আরেক পশলা বিদ্যুৎ নামল কাছেপিঠে। রক্ষীদের একজন ভয়ার্ত স্বরে বলল, 'বাবা রে! চোখে যে কিছুই দেখছি না!'

'মনে হয় পরেরটা ছাদেই পড়বে। আমি পালঙ্কের নিচে যাচ্ছি। দ্বিতলে থাকলে মনে হয় আজই আপনাদের শেষ দিন। বজ্রাঘাতের মড়া দেখেছেন? এক্কেবারে কালো কাঠ।'

গুড়ুম গুড়ুম শব্দে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠতে শুরু করেছে চারদিক। এক একটা ঝলকে যেন গোটা হস্তিনাপুর আলোয় ভরে যাচ্ছে। রক্ষী দুটো আর দেরি না করে দৌড়ল। দ্বিতলের বাকি রক্ষীরা এরমধ্যে জড়ো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শুনছিল ভুসুকুর কথা। তাঁরাও দৌড়োল পরিমরি করে।

'সবাইকে বলবেন নিচের ঘরগুলোয় ঢুকে পড়তে।'

বার্তাটা ছুঁড়ে দিয়ে ভুসুকু নিশ্চিন্ত হল। প্রকৃতির তাণ্ডব এখন কিছুক্ষণ চলবে। ভূতমিত্রের আশ্রমে থাকার সময় একদিন এতটা না হলেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন ভুসুকু লক্ষ্য করেছিল যে বজ্রপাতকে এখানকার লোকজন বেশ ডরায়। তাঁর নিজের দেশে অবশ্য এমন পরিস্থিতি মাঝে মাঝেই তৈরি হয়। তাঁর দেশের মত মেঘ-বৃষ্টি হস্তিনাপুরে নেই। এ দেশের মাটি রুক্ষ। তবে জল ভাল। দেহে বল আসে।

ভুসুকু ধীরে সুস্থে নিজের কক্ষে বসে কয়েকটি

বস্ত্রখন্ড পেঁচিয়ে দড়ি তৈরি করল। দড়িগুলো পর পর গিঁট দিয়ে যেটা পেল তা দিয়ে অনায়াসে জানালা দিয়ে নিরাপদে নিচে নেমে যেতে পারবে। পশ্চিম দিকের শেষ কক্ষের জানালা দিয়ে নেমে গেলে বাড়ির পেছনে যাওয়া যাবে সহজে। কারোর চোখে পড়ার প্রশ্নই নেই। বাড়িটি প্রাচীরে ঘেরা থাকলেও পেছন দিকের একটা গাছ বেয়ে প্রাচীরে উঠে পড়া খুব সোজা কাজ। ওপাশে নামার জন্য খানিকটা দড়ি আলাদা ভাবে কোমরে পেঁচিয়ে নিল সে।

বাইরে কুলুঙ্গিতে প্রদীপগুলো সব নিভে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি স্তম্ভে জ্বলন্ত মশাল পেল ভুসকু। মেঘের গর্জন আর হাওয়ার দাপটে মনে হচ্ছিল প্রলয় আসন্ন। ভুসুকু দ্রুত পায়ে পশ্চিম প্রান্তের শেষ কক্ষে পৌঁছে কাজ শুরু করে দিল। গত তিনদিনে ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখা হয়ে গেছে তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে। জ্বলন্ত মশালটা ঘরেই রেখে দিয়েছে যাতে অপর একটি জানালা দিয়ে নিচে থাকা রক্ষীরা আলো দেখতে পায়। আলো দেখলে তাঁরা ভাববে ভুসুকু সে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাচীরে উঠতেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় ভুসুকু বুঝল নিচে খানিকটা ঘাস জমি। কিছু দূরে প্রশস্ত রাজপথ। নিশ্চই পথপ্রহরায় থাকা রক্ষীরা আবহাওয়ার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। তাঁদের হাতে পড়লে ভুসুকু নিশ্চিন্ত।

কাক ভেজা হয়ে ভুসুকু রাজপথে এল। চারদিক অন্ধকার। তবে বিদ্যুতের আলোয় ভুসুকু বুঝতে পারছিল পথের দু'ধারে বাড়িঘর রয়েছে। সে সন্তপর্ণে হাঁটতে শুরু করল। দশ-বারো পা যেতেই কানে এল একটা স্বর— 'দাঁড়ান!'

ভুসুকু দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কিছু একটা তাঁর থেকে কয়েক হাত দূরে। তারপরেই কানে এল কপ্ কপ্ শব্দ। নিশ্চই কোনও অশ্বারোহী তাঁকে দাঁড়াতে বলেছে।

আকাশ চিরে আবারো খেলে গেল বিদ্যুৎ। কয়েক পলকের জন্য ভুসুকু স্পষ্ট দেখল একজন অশ্বারোহী। দীর্ঘ শরীর। এক হাতে বল্লম।

'আপনি এইমাত্র সাগর দেশের দূতাবাসের প্রাচীর টপকে এদিকে এলেন। আপনি কি ভুসুকু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনাকে কি সেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল?'

'আজ্ঞে।'

'আমি যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান তীক্ষ্ণশির। আপনি দ্রুত আমার ঘোড়ায় উঠে পড়ুন।'

'কেন?'

'ভয় নেই। আমি লোকজন নিয়ে গোপনে এ বাড়ির ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম যুবরাজের আদেশে। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর ভূতমিত্রের আশ্রমে ফিরবেন।'

ভুসুকু হতভম্ব হয়ে গেল। যুবরাজ যুধিষ্ঠির এরমধ্যে জড়িয়ে গেলেন কীভাবে? কিন্তু সেই মুহূর্তে এর বেশি কিছু ভাবার ছিল না। ভুসুকু হাঁচোড় পাঁচোড় করে ঘোড়ায় উঠল। দু'জনকে নিয়ে শক্তিশালী ঘোড়াটি কপ্ কপ্ শব্দে ছুটতে শুরু করল অনায়াস ছন্দে। বৃষ্টি তখনো মুষলধারে পড়ছে। মেঘ গর্জন একটু কমে এলেও বিদ্যুৎ চমকের শেষ নেই। সেই আলোয় দু'জনকে নিয়ে অনায়াসে ছুটতে লাগল ঘোড়া। বেশ কিছুক্ষণ ছুটল। বৃষ্টি ধরে এল তারমধ্যে। দেখতে দেখতে একটা বিরাট তোরণের সামনে এসে দাঁড়াল তাঁরা। সেটা আসলে একটা প্রবেশ দ্বার। ভুসুকু চিনতে পারল জায়গাটা। রাজকীয় অঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য সাধারণ মানুষ এই দ্বারটাই ব্যবহার করে। ভুসুকু একবার এখানে এসেছিল, কিন্তু ভেতরে যায় নি। উপযুক্ত কারণ এবং অনুমতি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।

বৃষ্টি ধরে আসায় ভিজে যাওয়া মশাল এবং অন্যান্য দীপগুলির পরিবর্তে নতুন আলো জ্বালান হচ্ছিল। চারদিক আবার আলোকিত হয়ে গেলে তীক্ষ্ণশির ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভুসুকু শুনেছিল ভেতরে একটা ছোটখাট নগর আছে। এবার স্বচক্ষে দেখতে পেল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়লেও আকাশের মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে আর তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে জ্যোৎস্না। ভুসুকু দেখল অপূর্ব সুন্দর বাড়িঘর-অট্টালিকা-প্রাসাদের মধ্য দিয়ে চলে গেছে ঝকঝকে, প্রশস্ত পথ। সুসজ্জিত এবং শক্তিমান অশ্বারোহী প্রহরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব সব রথে চেপে রাজপুরুষরা কেউ কেউ কোথাও যাচ্ছেন। অজস্র আলোয়ে ঝলমল করছে চারদিক। গীতবাদ্যের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে।

ভুসুকু তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাঁকে কেন বন্দি করা হয়েছে সেটা ধুর্জটিবর্মা নামক লাল চুলের লোকটা বলেছে বটে কিন্তু ভুসুকু ঠিকমত বুঝতে পারে নি। এক মাসের মধ্যে লালচুলের প্রস্তাবে রাজি না হলে কি তাঁকে বধ করে ফেলবে? ভুসুকুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

তীক্ষ্ণশির একটি প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে ঘোড়া থামালেন। সেখানে বেশ কয়েকটি মূল্যবান রথ দাঁড়িয়ে। অদূরে একটি আলোকিত ভবন। ভেতর থেকে হাসিতামাশার শব্দ ভেসে আসছে।

'এটা রাজকীয় পাশা সজ্ঞ।' তীক্ষ্ণশির জানালেন। 'আপনি আমাকে অনুসরণ করুন।'

ভবনের একপাশে একটি আলাদা কক্ষ। তীক্ষ্ণশিরকে অনুসরণ করে ভুসুকু সেই কক্ষে পা রাখল। কক্ষটি আসবাবহীন। মেঝেতে যে মাদুরটি পাতা তা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাল মিলিয়ে কয়েকটি উপাধান এদিক ওদিক রাখা।

'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। যুবরাজ পাশা খেলছেন। আমি তাঁকে অবহিত করার ব্যবস্থা করছি।'

ভুসুকু ইতস্তত করল। তাঁর শরীর একদম ভিজে গেছে। শীত শীত লাগছে। জল লেগে এই মূল্যবান মাদুরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

'আপনাকে এক্ষুনি শুকনো কাপড় এনে দেওয়া হবে।'

তীক্ষ্ণশির যেন ভুসুকুর অস্বস্তি বুঝতে পেরে বলল। সে চলে যেতেই একজন এসে ভুসুকুর হাতে ধরিয়ে দিল দু'খন্ড শুকনো বস্ত্র। এবার কাপড় বদলে আরাম করে নিচে বসল সে। তারপর বিড় বিড় করে নিজেকেই বলল, 'আশা করি স্বপ্ন দেখছি না।'

একটু পরে আরও একজন থালায় করে খাবার এনে রেখে গেল ভুসুকুর সামনে। কয়েকটি বড় আকারের লাড্ডু আর ঘটি ভরা কবোষ্ণ দুধ। ভুসুকু টের পেল তাঁর খিদে পেয়েছে। খাদ্যের প্রতি প্রবল আক্রমণ চালাল সে।

খাবার দিয়ে যাওয়া লোকটি দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। সে মৃদু স্বরে বলল, 'মহাশয় কি আরো কিছু ভোজনে ইচ্ছুক?'

দু-চুমুকে দুধের ঘটি শূন্য করে ভুসকু বলল, 'ধন্যবাদ! আপাততঃ আর দরকার নেই।'

'তাহলে যুবরাজ কি আসবেন এবার?'

'তিনি কি অপেক্ষা করছিলেন?' ভুসুকু ঘাবড়ে যায়।

'ক্ষুধার্ত এবং পরিশ্রান্ত ব্যক্তির সমস্যা দূর না হলে তিনি কীভাবে আসবেন বলুন? এমনিতেই হস্তিনাপুর অতিথি আপ্যায়নের জন্য প্রসিদ্ধ। তদুপরি আপনি স্বয়ং যুবরাজের অতিথি। চাইলে আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রামও গ্রহণ করতে পারেন।'

'না না!' ভুসকু লাফিয়ে ওঠে। 'তিনি আসতে পারেন। আমি প্রস্তুত।'

লোকটি আর কিছু না বলে বাসনগুলি তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর ভুসুকুকে মুগ্ধ করে দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন কক্ষে। সেই দীর্ঘকায় পুরুষের অঙ্গে শুভ্রবস্ত্র। শিরোভূষণটিও শুভ্র। সেই ভূষণে জ্বল জ্বল করছে একটি নীলবর্ণের পাথর। যেন নীলাভ দ্যূতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সেই রত্ন থেকে। কক্ষটি ভরে গেল একট অপূর্ব সুগন্ধে।

'আমি যুবরাজ যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠ পান্ডব।'

অভিভূত ভুসুকু প্রণাম জানাতে ভুলে গেল।

১২

উচ্চকপালের তিন ছেলে এক মেয়ে। বড়োটা রাজকীয় করণের অনুলিপি বিভাগের লেখক। তাঁর হাতের লেখা মুক্তোর মত। মেজটা রথ চালায়। ছোটটা অস্ত্রবিদ্যা শিখছে সেনায় নাম লেখাবে বলে। মেয়ের নাম মধুক্ষরা। তাঁর লেখাপড়ায় আগ্রহ আছে দেখে স্বয়ং দুর্বাসা মুনি মাঝে মাঝে তাঁকে বিদ্যাদান করতে আসেন। আজকেই তিনি বেলা তিন প্রহর নাগাদ এসে পড়বেন। উচ্চকপাল আর তাঁর বউ মোহনা খুব ব্যস্ত ছিল আতিথেয়তার আয়োজন নিয়ে। দুর্বাসা ভারি রগচটা মুনি। পান থেকে চুন খসলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। তবে মধুক্ষরাকে তিনি কিছু বলেন না। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তিনি খুবই স্নেহশীল।

সকাল সকাল একটা ভাল সংবাদে উচ্চকপালের মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। ভূতমিত্রের আশ্রম থেকে লোক এসে তাঁকে জানিয়ে গেছে যে আজ সুর্যোদয়ের পর পর ভুসুকু ফিরে এসেছে। সুস্থ শরীরে। কয়েক দিন হল ভুসুকুর সংবাদ না পাওয়ায় উচ্চকপাল একটু অশান্তির মধ্যে ছিলেন। না বলে কয়ে চলে যাওয়ার ছেলে সে নয়। হয় তো ফুর্তি করবে বলে নগরের কোনও পান্থশালায় গিয়ে উঠেছে। আশ্রমে থেকে তো সব ফুর্তি হয় না। অসুররা এমনিতেই একটু বেশি আমোদ-আহ্লাদ পছন্দ করে।

তিন প্রহর পড়তে না পড়তেই বাইরে একটা রথ থামার শব্দ পেলেন উচ্চকপাল। রথচুড়ায় হলুদ পতাকা দেখেই বুঝলেন মুনি এসে গেছেন। পরক্ষণেই একটা হুঙ্কার কানে এল 'এই ব্যাটা হতচ্ছাড়া শুষ্ক অশ্ববিষ্ঠা কোপ্‌লা! চোখের মাথা

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page

Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩

উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

খেয়েছিস নাকি?'

উচ্চকপাল তিন লাফে বাইরে বেরিয়ে প্রণাম জানিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে মহামুনি?'

'প্রবেশ পথ কর্দমাক্ত! মোছ এক্ষুনি!'

পথের কোণায় অল্প একটু কাদা জমে ছিল। মোহনা তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে সেটা মুছে দিলেন। দুর্বাসা এবার রথ থেকে নেমে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে একটা থলে আর হাতে লাঠি। অঙ্গে অতি উত্তম গেরুয়া বস্ত্র। চকচকে পরিচ্ছন্ন চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। বুক অবধি দাড়ি।

'পা ধোয়ার জল আন!'

মোহনা তামার কলসি ভরা জল এরমধ্যেই নিয়ে এসেছে। তার একটু পায়ে ঢেলেই দুর্বাসা তুমুল হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'অপদার্থ!'

মোহনা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'জল আমি একটু আগেই তুলেছি।'

'বেশ করেছ। এবার গরম করে নিয়ে এসো! এক দন্ড উষ্ণ সলিলে পদধৌতি না করলে মন শান্ত হবে না। হস্তিনাপুর একটা বিচ্ছিরি স্থান! এলেই মন আনচান করতে থাকে!'

উঠোনের কোণায় উনুনে তখনো আগুন ছিল। উচ্চকপাল প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে সেটা জ্বালাতে পারলেন। পদধৌতির পর দুর্বাসা প্রসন্ন চিত্তে বললেন, 'এবার ভোজন। আমি কিন্তু এখন ফল আর দুগ্ধ ছাড়া কিছু খাচ্ছি নে।'

মধুক্ষরা বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। মুনির আগমন সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসেছে। সে হাসিমুখে বলল, 'গতবার যখন এলেন তখন তো কেবল মাংস আহার করছিলেন।'

'আবার সে পর্যায়ে ফিরে যাব। আপাততঃ ফলদুগ্ধ। পরিমিত হলেই চলবে। অষ্টপ্রহরকালে আমি মাত্র সাত সের দুগ্ধ পান করি এখন। ফল চার পাঁচ ঝুড়ি হলেই হয়ে যায়।'

উচ্চকপাল গাই দোয়াতে ছুটল। মুনি কক্ষে প্রবেশ করে পদ্মাসনে আরাম করে বসলেন।

'বল এবার। আগ্রহোদ্দীপক কী কী ঘটল!' ছাত্রীকে শুধালেন তিনি।

'আপনি মাছের ঝোল খেয়েছেন গুরুদেব?'

দুর্বাসা উৎসুক হলেন। 'পাওয়া যাবে নাকি? শুনেছি অতি সুস্বাদু। পূবদেশের অসুরেরা এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।'

'ভূতমিত্রের আশ্রমে একজন পূবদেশিয় অসুর মাহুতের কাজ নিয়েছে। সে জানে। বাবা খেয়েছে।'

'বলিস কী?' দুর্বাসা উথিত পদ্মাসনে কয়েক পলক স্থির হয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলেন। 'ছোকরাটাকে আসতে বল সন্ধ্যায়।'

'কিন্তু রান্না করতে অতি মূল্যবান উপকরণ লাগে।'

দুর্বাসা চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কাঁচা লঙ্কা আর কাল জিরে। —বাপকে ডাক তো একবার।'

উচ্চকপাল পড়িমরি করে ছুটে এল।

'শোন কোপ্লা! পাতা আর লেখনি নিয়ে আয়। পত্র লিখে দিচ্ছি। রাজকোষাধক্ষ্যের করণে গিয়ে যাকে পাবি তাঁর হাতে দিবি।'

শেষ বিকেলের দিকে দেখা গেল উচ্চকপাল পত্র নিয়ে রথ ছুটিয়েছে কোষাধক্ষ্যের করণের দিকে। সূর্যাস্তের পর করণ বন্ধ হয়ে যায়। সেটা প্রায় হয়েই গেছে। একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে।

মহাকরণিক কুবের আয়ব্যায়ের জটিল একটা গণনা করছিলেন বলে তাঁর বের হতে দেরি হচ্ছিল। সেটা শেষ করে আনতেই একজন দৌড়ে এসে তাঁর হাতে একটা পত্র দিল। কুবের তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'সব্বোনাশ! এক্ষুনি মুদ্রাবিভাগের লোককে সংবাদ দাও। দুর্বাসা মুনি দক্ষিণা চেয়েছেন। কাঁচা লঙ্কা আর কাল জিরে।'

'লোক তো চলে গেছে মহাকরণিক!'

'ধরে আনার ব্যবস্থা করো। নইলে যেখান থেকে পার মুদ্রা সংগ্রহ করে বস্তুগুলো তাঁর কাছে পাঠাও। কাল করণে এসে পয়সা শোধ করে দেব।'

'আজ্ঞে তা হবে বটে।'

কাজ হয়ে গেল। কাঁচা লঙ্কা আর কাল জিরে নিয়ে উচ্চকপাল যখন ফিরলেন তখন সন্ধে গড়িয়ে রাত নেমেছে।

রথ পাঠিয়ে ভুসুকুকে নিয়ে আসা হল। দুর্বাসা জানালেন যে আগামীকাল তিনি ভূতমিত্রের আশ্রমে গিয়ে মৎস্য ভক্ষণ করবেন। তারপর অনেক গল্পগুজব হল। আশ্চর্য সব উপখ্যান শুনিয়ে দুর্বাসা সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলেন। ভুসুকু জানাল যে সে কোথাও যায় নি। হস্তিনাপুরে থেকেই ফুর্তি করছিল। ভুসুকু এমনটা বলল কারণ যুধিষ্ঠির তাঁকে সব কিছু গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাত দ্বিতীয় প্রহরের অবসান হলে সভা ভঙ্গ হল। সামনেই পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় পথ চলতে সুবিধে হয় বলে হস্তিনাপুরের পথে এখনও লোক চলাচল করছে। এদিকে ওদিকে থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত-বাদ্যের সুর। আশ্রমের কাছাকাছি এসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ভুসুকু। দু'জন অশ্বারোহী দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছে। এরা যুধিষ্ঠিরের লোক। ভুসুকুর নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা।

কিন্তু কেন? ভুসুকু ভাবে। তাঁকে কি আবার অপহরণের চেষ্টা হবে? এত লোক থাকতে তাঁকেই কেন বেছে নিয়েছিল পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মা? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও এটা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে ভুসুকুর মুখে পুন্ডরীকাক্ষের অভিপ্রায় শুনে তাঁর মুখ কয়েক পলকের জন্য থমথমে হয়ে গেছিল। তিনি অস্থির চিত্তে কিছুক্ষণ পাইচারি করার পর দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলেন, 'এ অবিশ্বাস্য!'

তারপর এগিয়ে এসে ভুসুকুর ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলেন, 'হে সুদূর পূবদেশের অসুর যুবক! তুমি বোধহয় কোনও বৃহত্তর কান্ডে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছ! সতর্ক থেকো। যে অভিজ্ঞতা হল তা গোপন রেখো।'

ঠিক হয়েছে ভুসুকু আশ্রমের বাইরে বের হলে নিরাপত্তা রক্ষী তাঁকে অনুসরণ করবে। ভীমসেনের জন্য মাছের ঝোল রান্না করে পাঠাতে হবে মাঝে মাঝে। উপকরণ আসবে রাজকীয় রন্ধনশালা থেকে। রান্নার জন্য ভুসুকু পাবে মাসে সাত মোহর। কিন্তু সব হবে গোপনে।

ভুসুকুর কাছে এটা বিরাট প্রাপ্তি। ভীমসেন স্বয়ং একদিন তাঁর সঙ্গে নিশ্চই সাক্ষাৎ করবেন। তখন নিজের গোপন ইচ্ছেটা তাঁর কাছে নিবেদন করবে ভুসুকু।

আশ্রমের সামনে রথ থেকে নেম সারথিকে বিদায় দিয়ে ভুসুকু গাছপালায় ঢাকা আলোছায়াময় পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল নিজের কুটিরের উদ্দেশে। হাতিটা তাঁকে দেখে আরেকবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল শব্দ করে শুঁড় দুলিয়ে। ভুসুকু এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক থ্রিলার। পর্ব ৩

মরা মৌমাছির চোখ

সাগরিকা রায়

পারিবারিক জটিলতায় আবদ্ধ শুভ দিগভ্রান্ত। পরিবার থেকে ক্রমশ এক ঘন গাঢ় কুয়াশার জালে জড়িয়ে পড়ছে ও। এক আবিল কণ্ঠ ক্রমাগত আদেশ করে চলে। জবালা সেই কণ্ঠের খোঁজ কি পেয়েছে? এরপর...!

১৩

গত দু'দিন ধরে কুয়াশার তীব্রতার সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হল। তিনদিনের দিন, হাওয়াটা বাড়ল। কিন্তু বৃষ্টি হল না। অসম্ভব ঠান্ডায় কাতর হয়ে পড়লেন জবালা। লেপ, কম্বল, হট ব্যাগ নিয়ে বিরক্ত হয়ে বায়না ধরলেন স্নান করবেন। নীলম বিব্রত হল। দ্রুত নামছিল গরম দুধ নিয়ে আসতে। দুধের মধ্যে একটু কফি ছিটিয়ে দিলে খুশি হন। সেটাই মাথায় ছিল। মনে হচ্ছে মাথাটা ফের গরম হয়েছে। মনের ভেতরে কী চলে, কে জানে!

সিঁড়িতে মুখোমুখি হয়ে পড়ল। প্রথমে চেনেনি। জ্যাকেট, টুপি ইত্যাদিতে আপাদমস্তক মুড়ে থাকা লোকটি যে শুভব্রত, তা বোঝার কথা নয়। কিন্তু নীলম বুঝল। চোখের দৃষ্টিটাকে লুকনো যায় না।

"বাড়ির সকলে কোথায়?"

"ঘরে। যে যার। বড়মনি ঘরেই।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বাবা! শুভব্রত এত কথা বলছে? তা আবার এমন নরম সুরে?

"শোন, আজ সন্ধের পরে ছাদে এস। কথা আছে।" দ্রুত উঠে গেল শুভব্রত। নীলম পেছন ফিরে তাকাতেই কেউ সরে গেল যেন। আবছা অন্ধকারে মানুষটিকে বুঝতে পারা গেল না। অস্বস্তি নিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিল নীলম। কে লুকিয়ে কথা শুনছিল! পদ্ম?

অনেকক্ষণ ধরে নীলমের মধ্যে অস্বস্তি ছিল। শুভর এ বাড়িতে আসা, নীলমকে ছাদে দেখা করার প্রস্তাব দেওয়া, আড়াল থেকে কেউ কথা শুনছিল। অদ্ভুত একটা বাড়ি। কে যে মিত্র, কে যে শত্রু বোঝা খুব মুশকিল।

বেশি দুধ দিয়ে কফি বানাতে বানাতে বুক শিরশির করছিল। কী বলতে চায় শুভব্রত? নীলমকে কেন ডাকল ছাদে? সন্ধের পরে!

বড়মনি আধশোয়া। শুভব্রত দাঁড়িয়ে আছে। ভ্রু সবসময়ের মতই কুঁচকে আছে। নীলম সেদিকে তাকিয়ে ফের বড়মনির দিকে তাকাল। চোখ বুজে আছেন কি!

"বড়মনি, কফি।"

"বেশ করেছ। এখন যাও।"

বাক্যব্যয় করল না নীলম। শুভব্রতর ধমক খেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পর্দার পাশে দাঁড়াল। ভয় হয়। কেউ যদি দেখে ফেলে! কিন্তু ভেতরে কী কথা হচ্ছে শুনতে হবে। জুতোর আওয়াজ! বড়দাবাবু! দেবব্রত? এদিকেই আসছে! বড়মনির ঘরের দিকে! নীলম থামের আড়ালে ছিল। ওকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবু চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল দেবব্রত। পর্দাটা একপাশে সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে করতে একবার পেছন ফিরে তাকাল।

নিস্পন্দ শরীরে অপেক্ষা করছিল নীলম। কে জানে বাবা! কী হচ্ছে! নিশ্চয় বৌদিও আসবে। এসে নীলমকে দেখতে পেলে! এবেলা পাশের ঘরে ঢুকে পড়তে হবে! নীলম বের হতে যাচ্ছিল। পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়াল। বৌদি? না। বৌদি নয়! কে তবে? সেকি! জেঠাবাবু! আচ্ছা, এ ঘরে সবার জমায়েত হওয়ার কথা ছিল! ও জানতো না। পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল নীলম। এ ঘর থেকে সব শোনা যাচ্ছে। বড়দাবাবু শুভব্রতকে ধমকাচ্ছে। বড়মনির গলা পাওয়া যাচ্ছে না। জেঠাবাবু চুপ! কিন্তু শুভব্রত এত ধমক সহ্য করছে কেন? শরীরে আগুন নেই? আসলে উনি হলেন খড়ের আগুন দপ করে জ্বলে ফের নিভে যান সহজে। পুরুষ হলে এভাবে দাঁড়িয়ে সহ্য করে যেত? নীলমের ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঁচকে যায়। এমন পুরুষ হয়ে লাভ কী?

১৪

কঙ্কা মনখারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুবর্ণা এগিয়ে এল। বোনটা বেড়াতে এসে কী ঝামেলার

মধ্যেই না পড়ল! তবু বাবুইকে নিয়ে ব্যস্ত আছে বলে সংসারের খুঁটিনাটি দিকগুলো সেভাবে বোঝে না। দু'বোনের চরিত্রের বিস্তর ফারাক। একজন শান্ত ধীর স্থির নির্বিরোধী। অন্যজন! অন্যজন কী? সুবর্ণা ভ্রূ কুঁচকে নিজেকে দেখল আয়নায়। কঙ্কা লোভি নয়। কিন্তু সুবর্ণা কি লোভি? হকের ধন আঁকড়ে থাকা কি লোভের লক্ষণ? তাই যদি হবে, তাহলে কে লোভি নয়?

"কী রে? চুপচাপ হয়ে গেছিস।"

"ভাল লাগছে না। মায়ের জন্য মন খারাপ লাগছে।"

"তোর এখানে ভাল লাগছে না। দাঁড়া, পদ্মকে বলি একটু কফি করে দিতে। আজ রেখার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু কাউকে জানাতে পারবি না এ কথা। এরা রেখাকে পছন্দ করে না। ওদের সঙ্গে এ বাড়ির ঝামেলা আছে।"

দ্রুত বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি ভাঙে সুবর্ণা। এই ঠান্ডায় কফি রোচে ভাল। কিন্তু পদ্ম কোথায়? অবাক হয়ে গেল সুবর্ণা। বাড়িটা অসম্ভব চুপচাপ। এতগুলো লোক বাড়িতে, সব গেল কোথায়?

"পদ্ম!" গলা সামান্য তুললো সুবর্ণা। এ বাড়িতে একবারের বেশি ডাকাডাকি করার নিয়ম নেই। তবু বিস্মিত সুবর্ণা আর একবার গলা তুললো। আর তখনই শুনতে পেল পায়ের শব্দ। কেউ দ্রুত নেমে আসছে! এত রাতে? কে ওখানে? পদ্ম কি?

নাহ! ফের নীরব বাড়ি!

কেন যেন ভয় পেল সুবর্ণা। মনে হল, কুয়াশা ঢাকা এই পৃথিবীতে ও একা এবং জীবিত।

"কে? কে ওখানে?" বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল সুবর্ণা। কে যেন এগিয়ে আসছে! এদিকেই আসছে!

"আমি নীলম!"

নীলম! তাহলে একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল কে? নীলম এখানে কী করছে!

১৫

বাদলা আজ অল্প ফুল নিয়ে এসেছে। মুখটা শুকনো। খুব ঠান্ডা বলে ফুল পাওয়া যাচ্ছে না। নীলম হতাশ হল। বড়মনি এতটুকু ফুল দেখে রাগ করবেন।

"তোর মা কেমন আছে?"

"ভাল না। অসুখ সারছে না। সেই যে ভয় পেয়েছিল!"

বাদলা চলে গেলে ফুল নিয়ে বড়মনির ঘরে এল নীলম।

"আজ ফুল খুব কম।"

জবালা কথা বললেন না। লাল চোখ তুলে তাকালেন। আজ চোখ ঘোর লাল হয়ে উঠেছে। প্রথমে খেয়াল করেনি নীলম। বকবক করে যাচ্ছিল। আসলে ও বড়মনিকে কথা বলাতে চায়। কথা বললে মনের ভার কমে।

"ফুলমনির অসুখ করেছে। বাদলার ওপরে চাপ পড়েছে।"

বড়মনি এবারেও জবাব না দেওয়ায় সেদিকে নজর পড়ল নীলমের। এ কী? এত লাল টকটকে চোখ! বড়মনির চোখ বরাবরই রক্তাভ, কিন্তু এতটা? এরকম কখনও দেখেনি নীলম! আর দৃষ্টি অস্বাভাবিক। চোখ দুটো তুলে ঘরের চারপাশে তাকালেন।

"বড়মনি!"

শুনতে পেলেন না জবালা। কেমন অদ্ভুত স্বরে কিছু বললেন। বুঝতে পারল না নীলম।

"কিছু বলছেন?"

"এসেছ? তুমি এসেছ? এতদিন পরে এলে তুমি?"

"কার সঙ্গে কথা বলছেন বড়মনি?" নীলম ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। ভয় ভয় করে উঠল ওর।

কখনও দেওয়ালের দিকে, কখনও আলমারির দিকে তাকিয়ে অনর্গল কথা বলে চলেছেন জবালা! নীলম ঘরে আছে কিনা সে খেয়াল নেই যেন! যেন মন্ত্রমুগ্ধ। যেন অন্যলোকের অধিবাসী! ইহলোকের কেউ নন!

জীবনে অনেক রকম পরিস্থিতি পার করে এসেছে নীলম। ভয় কাকে বলে জানতো না। কিন্তু আজ ভয় পেল। ভীষণ রকম ভয়!

কোনওরকমে ঘোরও থেকে বেরিয়ে এল ও। একবার জোরে পদ্মকে ডেকে উঠেছিল! কোনও কারণ ছাড়াই! তারপর ছুটলো সুবর্ণার ঘরের দিকে। আর কার কাছেই বা যাবে!

সুবর্ণা সব শুনে দেবব্রতকে ফোন করল। এরপর

ডাক্তার এসেছেন। বললেন, "সম্পূর্ণ মানসিক রোগে ভুগছেন উনি। একটা বড় শক পাওয়াতে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নড়ে গেছে! আর সেই কারণেই কথাবার্তায় অসঙ্গতি। সবসময় একই ব্যাপার নিয়ে ভাবেন বলে তিনি সেটাকে তাড়াতে পারেন না। বেরিয়ে আসতে পারেন না। একটা কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে আছেন। এখন পরিবারের আন্তরিকতার দরকার খুব বেশি।"

ছুটল বড়মনির ঘরের দিকে। নীলম ছুটল যোগিনের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা খবর পাঠাতে হবে। ফোন করার কথা ভুলেই গেল। আর তখনই শুভব্রতর সঙ্গে একটা কলিসন হতে হতে বেঁচে গেল।

"কী হল?"

"বড়মনি অসুস্থ!"

শুভব্রত ছুটল মায়ের ঘরের দিকে। নীলম সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কিছু মনে পড়াতে ছুটল। জেঠাবাবুকে চাই। উনি কী বলেন! ইস, যোগিন এত বেলাতেও সিঁড়ির আলোটা নিভিয়ে দেয়নি!

ডাক্তার এসেছেন। বললেন, "সম্পূর্ণ মানসিক রোগে ভুগছেন উনি। একটা বড় শক পাওয়াতে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নড়ে গেছে! আর সেই কারণেই কথাবার্তায় অসঙ্গতি। সবসময় একই ব্যাপার নিয়ে ভাবেন বলে তিনি সেটাকে তাড়াতে পারেন না। বেরিয়ে আসতে পারেন না। একটা কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে আছেন। এখন পরিবারের আন্তরিকতার দরকার খুব বেশি।"

সারাদিন ঘুমিয়ে বিকেলের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। সুবর্ণা কপালে হাত বুলিয়ে দিল। ইশারায় নীলমকে বলল খাবার নিয়ে আসতে। নীলম তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছে, তখন দেখল মানসরঞ্জন আসছেন। হরিণের চামড়ার চটির একটা বিশেষ শব্দ থাকে।

ভালই হল। ভাবে নীলম। খাবারটা খাওয়াতে সুবিধে হবে। বড়মনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন! স্বামীর মৃত্যুটা বড়মনিকে খুব আঘাত দিয়েছে।

খাবার নিয়ে দরজায় পৌঁছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন এই সঙ্কোচ? উনি বড়মনির ভাসুর। আসলে বড়মনির প্রতি জেঠাবাবুর এই আন্তরিকতা একটা নির্ভরতার জানান দেয়। মূল কথাটা সেই চিরন্তন সমস্যা। নারী পুরুষের সমস্যা। পাত্র-পাত্রী যতই বয়স্ক হোন, যতই গুরুজন স্থানীয় হোন তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। মানুষের মন আসলে যেন নোংরার ঝুড়ি।

নীলম নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হল। ওই তো জেঠাবাবু বড়মনির হাতখানা নিয়ে নাড়ি দেখছেন। নীলমকে দেখে ইশারায় থালাখানা টেবিলে রাখতে বললেন।

বড়মিনির চোখ বোজা। জেঠাবাবু খাবার খাইয়ে দিতে বললেন। নীলম প্রমাদ গুনলো। বড়মনিকে খাওয়ানো যে কী মুশকিল!

বড়মনি নিজেই উঠে বসলেন। খাবারের থালা এগিয়ে দিতে বললেন। একটু একটু করে দাঁতে কাটলেন খানিকটা। তারপরে থালা সরিয়ে রাখলেন। খেতে ভাল লাগছে না। বড়মনি উদাস চোখে দেওয়াল জোড়া আয়নায় নিজেকেই দেখছিলেন। নীলম ভাবল, আশ্চর্যের বিষয় হল একটাই ওর কাছে! এত দুর্বলতা, এত দুঃখ, কিন্তু বড়মনি যেন উনিশ বছরেরই আটকে আছেন! এটা নিয়ে কেউ তো কিচ্ছু বলে না!

সুবর্ণা সন্ধের দিকে এল। সঙ্গে কঙ্কা। জবালা চোখ তুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। ভারি সুন্দর তিরতিরে লাবণ্য মুখ জুড়ে আছে মেয়েটির। ইশারায় বসতে বললেন। কঙ্কা প্রণাম করল। জবালা জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ।" একটু হাসল কঙ্কা। কী ভাল মানুষ ইনি। অথচ বেজায় ভয় পেয়েছিল কঙ্কা।

"তুমি যাও। সুবর্ণা থাকো। কথা আছে।"

সুবর্ণা আন্দাজ করেছিল। জবালা সে কথাই বললেন ফাঁকা ঘরের গোপনীয়তার মধ্যে।

"তোমার বোনটকে দাও। শুভর মাথাটা ঠিক হয়ে যাবে। ও সুখী হবে। একটিই ভিক্ষে চাই তোমাদের কাছে! রাখবে?"

বজ্রপাত হল না। সুবর্ণা বড়মনির হাবেভাবে কিছুটা অনুমান করেছিল। তবু অস্বস্তি নিয়ে বসে রইল মাথা নীচু করে। কী বলবে! এমন অবাস্তব কথার কী জবাব দেওয়া যায়? কঙ্কার মত সুন্দরী বিদুষী কেন সাধ করে শুভর মত ছেলের গলায় মালা দিতে যাবে?

"আমি আপনার ছেলেকে বলি।"

"বেশ।" জবালা খাটের দিকে ফিরলেন। শোবেন বুঝি। সুবর্ণা এগিয়ে গিয়ে ধরে শুইয়ে দিল। বিদায় নিয়ে আসতে আসতে একবারের জন্য পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল, বড়মনি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন!

বুঝে ফেললেন নাকি সুবর্ণার মনের কথাটা? কে জানে! এ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে আবার মাথা গরম! সে আরেক সমস্যা। সুবর্ণা বা দেবব্রত তাঁকে অমান্য করছে, এটা যদি বুঝতে

পারেন, বাড়ি জুড়ে হই হই পড়বে। মাথা গরম করে যা তা করবেন! হোক। সেই ভয়ে শুভর সঙ্গে কঙ্কার বিয়ে দেওয়া চলবে না। না হয়, কঙ্কার বিয়ে হবে না কোনওদিন, তবু ভাল।

পর্দা সরাতেই কেউ সরে গেল! চমকে উঠেছে সুবর্ণা। কেউ কথা শুনছিল! এত দ্রুত লুকোল বা কোথায়? গরম শালখানা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুবর্ণা। দেখতে হবে। কে, কার এত উৎসাহ এই কান পাতার খেলায়? মাঝে মাঝেই এটা হচ্ছে! কে আড়ি পাতছে? কেন? কী তার উদ্দেশ্য?

নিস্তব্ধ বারান্দা জুড়ে কনকনে বাতাস খেলা করে যাচ্ছিল। আজ বৃষ্টি হতে পারে! বারান্দায় আলো আর ছায়ার কারিকুরি অদ্ভুত খেলায় মেতেছে। মনে হচ্ছে ওই দূরের বাঁকটার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সুবর্ণার দিকে পেছন ফিরে। এখনই মুখোমুখি হবে ঘুরে দাঁড়ালেই! কে ওটা? সুবর্ণা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কোথাও কেউ নেই! শূন্য বারান্দা জুড়ে সোফা সেট, কাউচ মনমরা হয়ে পড়ে আছে! ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি! মনে হল, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কেউ! সুবর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, "এই, কে ওখানে?"

কেউ জবাব দিল না। ঠান্ডা হাওয়া খেলে গেল শুধু সুবর্ণাকে ছুঁয়ে। শিরশির করে উঠল সুবর্ণার শরীর। হালকা পায়ে কে ছুটে গেল ওদিকের বারান্দা দিয়ে। তাহলে এদিকেই আসবে নিশ্চয়। সুবর্ণা তাকিয়ে থাকে কে আসছে দেখার জন্য। কেউ এল না। সব ভারি শান্ত। সুবর্ণা ভাবল, পদ্মকে ডাকবে কিনা। ডাকলে বিপদ। গল্প ছড়াবে পদ্ম, বৌদি ভয় পেয়েছে আজ। ব্যাস। সব জড়োসড়ো হয়ে এক জায়গায় দলা পাকিয়ে থাকবে। তখন এক কাপ চা পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হবে। নিজেই দেখা যাক। সুবর্ণা এগিয়ে যেতে থাকে চারপাশে চোখ রেখে। এদিকের ডান বা বাঁ দিকের প্যাসেজগুলো বেশ অন্ধকার।

দিনের বেলাতেও আলো জ্বেলে রাখা দরকার এখানে। বলা কি যায়, চোর ডাকাত লুকিয়ে থাকতে পারে। এত বড় বাড়ির গুচ্ছের বারান্দা, লম্বা লম্বা প্যাসেজ, পরপর ঘর। যার বেশির ভাগই বন্ধ। বছরে একবার খুলে ঝাড়পোঁছ হয়। এই জন্যই এদিকটা বড্ড শুনশান। আচ্ছা, কে কান পাততে এসেছিল? কী শুনেছে সে? কতটুকু শুনেছে?

ধীর পায়ে এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে পা ফেলে সুবর্ণা। আর উড়িয়ে দেওয়া নয়। এবারে সাবধান হওয়া দরকার। ওদের দিকে নজর রেখেছে এমন কেউ এ বাড়িতে আছে, অথচ ওরা জানতে বা চিনতে পারছে না তাকে! আশ্চর্য।

সুবর্ণা নিজের ঘরে ঢুকে দেখল কঙ্কা বাবুই কেউ ঘরে নেই। গেল কোথায় ওরা? এই ঠান্ডায় বাইরে ঘোরাঘুরি না করাই ভাল। একটা হুড়োহুড়ির শব্দ আসছে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে। সঙ্গে বাবুই এর হাসি। আচ্ছা, ওরা তাহলে...!

১৬

নীলমের স্নান হয়ে গেছে। আজ ইচ্ছে করে কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করেছে। কাঁপছিল ও। এক চিলতে রোদ নেই যে গিয়ে দাঁড়াবে! ঘরে ঢুকে মোটা মণিপুরি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে আরাম হল না। অগত্যা ছোট পাতলা কম্বল গায়ে জড়িয়ে কিচেনে চলে গেল। চা খেতে হবে।

ব্রজেন কড়াতে কী চাপিয়েছে। পেছনে কেউ এসেছে বুঝে তাকিয়ে চমকে উঠল-ওহ, তুমি! যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

"তোমরা দিনের আলোয় ভূত দেখছো। একটু সরে দাঁড়াও। চা করি।"

"তুমি কেন ? আমি করে দিচ্ছি। কড়ক চা? নাকি লিকার?"

"যা খুশি। কিন্তু গরম থাকে যেন।"

আরামটা কেবল উপভোগ করতে চায়ে চুমুক দিয়েছে, অমনি ব্রজেন ভয়চকিত চোখে তাকাল। নীলম ওর চোখের দৃষ্টি দেখে আশ্চর্য —কী হল ব্রজেন?

"ছোটদাবাবু।"

"কোথায়?"

"এইমাত্র গেলেন। ওই যে?" জানালার দিকে আঙুল তোলে ব্রজেন। নীলম ঝুঁকে পড়ল। শুভব্রত আসছে।

"ফের বড়মনির কাছে গিয়ে ঝামেলা না করে।" নীলম দ্রুত পা চালায়। হিসেব মত পা চালিয়েছিল বলে সিঁড়ির মাঝামাঝিতে গিয়ে পেয়ে গেল ওকে।

"কী হল?" শুভব্রত চোখ কুঁচকে তাকাল।

ঘণ্টাখানেক উনি এখন বাথরুমেই থাকবেন। আচ্ছা, উনি এসে কী করেন? আসবেন। অনেকক্ষণ বড়মনির ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে। তারপর উনি বেরিয়ে যাবেন। বড়মনির দরজা ফের বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদিনে একটা স্ফটিকের পাত্রের জল ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না বড়মনি। পদ্ম বলেছিল, বুড়িটা ডাকিনী বিদ্যা জানে। বড়মার বয়স আটকে রেখেছে মন্ত্রে। প্রতিমাসে এসে রিচার্জ করে দিয়ে যায়! সত্যি কি তাই? পদ্ম এত কথা জানল কী করে?

"কথা আছে। আজ সেখানে এস।" নীলম দাঁড়ায় না। পাশ কাটিয়ে উঠে যায়। এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে একটা শ্রাগ করে শুভব্রত উঠে গেল। মায়ের ঘরের দিকে যাচ্ছে। গতকাল আসা হয়নি।

সারাদিন ধরে একটু রোদের দেখা মেলেনি। কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কখনও কম, কখনও বেশি হয়ে আকাশটা ঢেকে রেখেছে মেঘ। বিকেলের দিকে একটু ধরে এল বৃষ্টিটা। বড়মনিকে কফি দিয়ে ঘড়ি দেখল নীলম। মাত্র সাতটা পাঁচ। শীতকাল, আর ওয়েদার এমন বিশ্রি বলে মাঝরাত মনে হচ্ছে। আশেপাশের বাড়ির সব যেন ঘুমিয়ে কাদা। কেউ আছে বলে মনে হয় না। আরও মুখ দেখাদেখি নেই। আসলে এই ওয়েদারে জানালা দরজা বন্ধ করে রাখতে হয়। ভেতরে আলো জ্বলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

শুভব্রত আসবে কখন? সেদিনের পর আর কথা হয়নি। আজ দরকারি কথা আছে।

"কটা বাজে?" বড়মনি চোখ তুলে তাকিয়েছেন —আজ মাঘের কত তারিখ?

-"অ্যাঁ?" নীলম চমকে উঠেছে "সাতটা কুড়ি...না পঁচিশ। ...আজ মাঘের বাইশ।"।

"বাইশ? কাল সে আসবে।" বিড়বিড় করেন বড়মনি —বাথরুমে নিয়ে চল।

নীলম ওঁকে ধরে ধরে বাথরুমের দরজায় নিয়ে এল। ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। দরজা ভেজিয়ে দিতে যেতেই বড়মনি বললেন, "গিজার অন করে দে।"

নীলম বুঝল উনি স্নান করবেন। ঠান্ডা-গরম জল মিশিয়ে দিল নীলম। বড়মনির ঝোঁক চেপেছে স্নান করবেন। এই রকম পাগলামি তিনি করেন কখনও কখনও। বারণ শুনবেন না। নীলম সব গুছিয়ে দিয়ে বাইরে এল। কাল তিনি আসবেন। কার কথা বলল বড়মনি? মাসে একবার তিনি আসেন। ঠিক। উনি আসার আগের দিন রাতেই স্নান করেন বড়মনি। তারমানে কাল সেই দিন?

বেশ। ঘণ্টাখানেক উনি এখন বাথরুমেই থাকবেন। আচ্ছা, উনি এসে কী করেন? আসবেন। অনেকক্ষণ বড়মনির ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে। তারপর উনি বেরিয়ে যাবেন। বড়মনির দরজা ফের বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদিনে একটা স্ফটিকের পাত্রের জল ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না বড়মনি। পদ্ম বলেছিল, বুড়িটা ডাকিনী বিদ্যা জানে। বড়মার বয়স আটকে রেখেছে মন্ত্রে। প্রতিমাসে এসে রিচার্জ করে দিয়ে যায়! সত্যি কি তাই? পদ্ম এত কথা জানল কী করে?

যাক, এখন শুভব্রত এলেই হল। কথা বলা যাবে।

"নীলম!"

আশ্চর্য! বড়মনির গলা না? নীলম অবাক হল। আবার কী চাই?

"বলুন বড়মনি।" বাথরুমের দরজার বাইরে থেকেই প্রশ্ন করে নীলম।

"আমি বেরিয়ে পুজো করব। ব্যবস্থা করে রাখ।"

এখন পুজো করবেন? ফুল পাবে কোথায় নীলম? তাড়াতাড়ি করে চন্দন বেটে, ধূপ প্রদীপ জ্বেলে রাখল। এবারে বাগানে যেতে হবে। কিছু ফুলের কুঁড়ি আছে। সেগুলোই নিয়ে আসতে হবে।

কাজ করার মধ্যে মন অন্যখানে ঘুরছে। পরিচিত পায়ের শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত কাজে আটকে পড়েছে। নয়ত... নয়ত? একটা আশঙ্কা বুকের ভেতরে আটকে থাকে। শুভব্রত আসবে কি?

পরমুহূর্তে মন সবল হয়ে ওঠে। আসতেই হবে ওকে। নীলমের কাছে আজ আসতেই হবে। কিন্তু ও আসছে যে, সেটা নীলম বুঝবে কী করে? পায়ের শব্দ পাবে কী করে? রাস্তাটার মোড়ে রামলীলা হচ্ছে। এত হইচই! শব্দ আলাদা করে পাওয়াই মুশকিল। আচ্ছা, এমন হতে পারে, শুভ এসে দাঁড়িয়ে আছে। নীলম কি ওকে দাঁড় করিয়ে রাখবে? না না! তাই কি আর পারে নীলম? নীলম হাসে। দুর্বোধ্য হাসি। হয়ত ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে নীলমের প্রতীক্ষায়!

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় নীলম। বড়মনির স্নান সারতে অনেক দেরি আছে। তাছাড়া সব তো গুছিয়েই রাখা আছে। এই হল সময়। দরজাটা টেনে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নীলম। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

১৭

রাতে ঠান্ডা বেড়েছে। খুব ঠান্ডায় কুঁকড়ে শুয়ে

ছিল নীলম। যথারীতি বড়মনির ডাকে ঘুম ভাঙল। আলসেমি করার সময় নেই। বড়মনি ডাকলেই উঠে পড়তে হবে। এটাই নিয়ম। উঠে পড়ল নীলম। বড়মণি বারান্দায় দাঁড়িয়ে মন দিয়ে কিছু করছিলেন। নীলম কৌতূহলী হয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল। কী করছেন বড়মনি?

বারান্দায় কিছু ড্রসেরা গ্রুপের গাছ রয়েছে। মাংসাশী গাছ। পোকামাকড় খায়। বড়মনি একটা কফি কালারের শিশি থেকে ছোট ছোট লালচে পোকা গাছের পাতায় ছেড়ে দিচ্ছিলেন। পাতা নিমেষে সঙ্কুচিত হয়ে চারপাশ থেকে চেপে ধরে পিষে মারছিল পোকাটিকে। একই রকমভাবে পাশের বাকি তিনটে গাছের ওপর পোকা ছেড়ে দিচ্ছিলেন বড়মনি। নীলম সহ্য করতে পারল না। সরে আসতে গিয়ে বড়মনির মুখের দিকে তাকাল। অদ্ভুত হাসি খেলে যাচ্ছে বড়মনির ঠোঁটে। চোখ নিষ্পলক। নীলম দ্রুত সরে এল।

এরপর বড়মনির স্নানের জল, পুজোর জোগাড় ইত্যাদি সেরে নিতে নিতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল নীলম। রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি।

জবালা স্নানে ঢুকলেন। নীলম সব গুছিয়ে দিয়ে ফুলের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফুলমনি ভূত দেখার পর থেকে আর আসে না। মেয়ে বাদলা আসে। কিন্তু আজ যা ঠান্ডা। বাদলা কি আসবে ফুল দিতে?

ঠিক তখনই কুয়াশামাখা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসা বাদলা থমকে দাঁড়াল। ওটা কী? তারাপদর বৌ কনক না? মা কি ওকেই দেখেছিল? একটা মর্মান্তিক চিৎকার করতে গিয়ে থমকে গেল ও। কেউ তো ছুটে আসছে না! কেবল নীল আঁচলখানা উড়িয়ে দিচ্ছে কেউ! বাদলা একবার পেছন ফিরে তাকাল। বাড়ি অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছে। এখন এগিয়ে যাওয়াটাই প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রশস্ত। এই ভাবনা স্পষ্ট করে না হলেও আবছাভাবেই বাদলার মাথায় ঢুকে থাকবে। সে আড়াআড়িভাবে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। সঙ্গে চিৎকার, "ভূত! ভূত! দিদি গো ভূত!"

একটা হৈচৈ কানে এসেছিল। কিন্তু বিশেষ পাত্তা দেয়নি, নাকি অন্যমনস্কতার দরুণ শুনতে পায়নি কে জানে! যোগিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, "দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। বাদলাও আজ ভূত দেখেছে।"

নীলম নির্বিকার। এরা রোজই ভূত দেখে। একটু তাকিয়ে দেখল যোগিনকে। শান্ত গলায় জানতে চাইল, "কোথায়?"

"বাড়ির পেছনের দিকে। নাকি আঁচল উড়িয়ে ডাকছিল বাদলাকে!"

"আর বাদলা তখন ছুটে এসে খবর দিল?"

"তুমি বিশ্বাস করছ না দিদি। বাদলাকে দেখে যাও কেমন করছে! ঠিক ওর মায়ের মত।"

অগত্যা নীলম উঠল। না ওঠা পর্যন্ত এরা ছাড়বে না। নীচে এসে দেখে এল বারান্দার এক কোণে পদ্ম, ব্রজেন সব বসে আছে বাদলাকে নিয়ে।

"তোরাই ভূত দেখবি? আমাকে একদিন দেখা।"

"দিদি, আমি...আমি...উফ!" বাদলা তোতলায়। বাদলার গলায় কথা আটকে যাচ্ছে। সেটা ভয়ে কতটা, বা ঠান্ডায় কতটা সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

"চল, কোথায় আছে ভূত, দেখাবি।" নীলম ইশারায় উঠতে বলল বাদলাকে। সবাই ভীত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। তখন যোগিন হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠল, "আমি যাচ্ছি দিদির সঙ্গে। কে কে যাবে চল। দিদি আছে আমাদের সঙ্গে।"

ঠান্ডায় পা চলে না। তবু বাদলা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এ বাড়ির পেছনদিকটাতে সে কনককে দেখেছে। আঁচল উড়িয়ে ঘুরছিল।

নীলম এগিয়ে যাচ্ছিল। কিছুটা এগোনোর পর মাঠের কোণ ঘেঁষে খানিকটা জমি বহুদিন ধরে অবহেলায় পড়ে আছে। ইদানিং শরিকদের আবর্জনা ফেলার মোক্ষম স্থান হয়ে উঠেছে। ঘুরে সেখানে যেতেই চমকে উঠল যোগিন।

"দিদি! ওই দেখ!"

"ওটা কী? কে? দিদি গো, ওটা মানুষ গো!" ব্রজেন চিৎকার করেছিল কতটা জোরে কে জানে! পাশের বাড়িগুলোর জানালা খুলে গেল। অত ভোরে শয্যা ত্যাগের নিয়ম এ বাড়ির মত অন্য পরিবারে নেই। কিন্তু এত ভোরে এমন মর্মান্তিক আওয়াজটা অস্বাভাবিক তো বটেই!

ওদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল অনেকেই।

"কী হল?"

"দেখুন, ওখানে একটা মানুষ!"

নীলম থরথর করে কাঁপছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায় চেয়ারের ওপর বসে পড়ল ও। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। একটা মানুষ পড়ে আছে! ঝোপঝাড় আবর্জনার মধ্যে এমনভাবে পড়েছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটা পায়ের পাতা কেবল অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বড়মনিকে কিচ্ছু বলা যাবে না। কিন্তু বড়মনির সামনে নিজের অস্বাভাবিক আচরণটা দেখানো যাবে না। এবারে পুলিশ আসবে। তারপর?

"ওখানে মানুষ?" কোলাহলটা বাড়ছিল। এদের মধ্যে উৎসাহী অভিজ্ঞ লোকটি এগিয়ে এল।

"ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। পুলিশে খবর দিতে হবে। কেউ টাচ করবেন না।"

পুলিশ আসা পর্যন্ত ভিড় জমতে থাকল। একটা মানুষ পড়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। মৃত বলেই মনে হচ্ছে।

নীলম থরথর করে কাঁপছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায় চেয়ারের ওপর বসে পড়ল ও। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। একটা মানুষ পড়ে আছে! ঝোপঝাড় আবর্জনার মধ্যে এমনভাবে পড়েছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটা পায়ের পাতা কেবল অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বড়মনিকে কিচ্ছু বলা যাবে না। কিন্তু বড়মনির সামনে নিজের অস্বাভাবিক আচরণটা দেখানো যাবে না। এবারে পুলিশ আসবে। তারপর?

সুবর্ণাকে ডেকে তুলেছে দেবব্রত, "শুনতে পাচ্ছ? একটা অস্বাভাবিক কোলাহল শোনা যাচ্ছে না?"

কান পেতে শুনল সুবর্ণা। বিছানা থেকে দ্রুত নেমে এল। আর তখনই নীলম এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। ওর আতঙ্কগ্রস্ত চেহারাটা দেখে সুবর্ণা কেঁপে উঠেছে। দেবব্রত বের হল। নীলমের থেকে যা শুনেছে, পুলিশ এলে সামনে দাঁড়াতে হবে। এ বাড়ির পেছনের জমিটা ওদেরই। কার লাশ পড়েছে ওখানে দেবব্রতর তো জানা দরকার!

বাইরে থেকে আসছে যোগিন। ওকেই ডাকতে এসেছে।

"পুলিশ এসেছে।"

"যাচ্ছি।" দেবব্রত এগিয়ে গেল। দেহ সনাক্ত করতে ডাকবে কি? পুলিশ আবার ওদের জমিতে লাশ পেয়ে হাঙ্গামা না করে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে যেন কী? এত শোনা কথা, অথচ মনে আসছে না! দেবব্রত, তুমি কি নার্ভাস?

পুলিশ ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন, "আমরা লাশটা বের করছি। আক্রম, লাশের ওপর থেকে রাবিশ সরিয়ে লাশ বাইরে আন।"

আক্রম নামের কনস্টেবল লাশের ওপর থেকে ঘাস-পাতা ঝোপঝাড় সরিয়ে দিল। একটা গর্তের মধ্যে পড়েছে লাশটা। উপুড় হয়ে আছে। কেবল লালচে ধূসর কম্বলখানা উঁচু হয়ে আটকে আছে একটা উঁচু ডালের ওপরে। বাতাসে সেটাই কাঁপছিল।

দুজন মিলে জায়গাটা সাফাই করে দিতে ভিড়টা এগিয়ে এল। দেবব্রত কৌতূহলী হল। কে? কার লাশ ওটা?

লাশটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতেই চিৎকার করে উঠেছে দেবব্রত। না! না! এ হতে পারে না! এই নির্জন বৃষ্টিভেজা সকালে একটা গর্তের ভেতরে লাশ হয়ে পড়ে আছে শুভব্রত! রক্তাক্ত দলা পাকানো মাংসের ডেলা একটা! মুখ রক্তে মাখামাখি। শেষবারের মত রক্তে হোলি খেলেছে শুভ। দেবব্রতর ছোট ভাই!

আর ঠিক তখন একটা বৃদ্ধা শকুনি চুপচাপ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। সোজা সিঁড়িতে উঠে জবালার ঘরের সামনে। জবালা আজ শরীরে নতুন হবে। সূর্যের তাপে ভরা জল, বাতাসের শ্বাসে ঘন সেই জল, মাটির গুঁড়োয় হালকা ছাই রঙা সেই জল বৃদ্ধার অঙ্গুলির স্পর্শে অন্য চেহারা নিয়েছে, যা দৃষ্টির অগোচর। আজ সারাদিন কারও মুখদর্শন নয়। খাদ্য বলতে একফোঁটা করে সেই মন্ত্রপূত জল। অজানা এক দুর্গন্ধময় তেলে শরীর মসৃণ হবে। কালাযাদুর বলে জবালা আজও যুবতী।

ঘরের দরজা বন্ধ হল। ভেতরে চলল অমানুষিক এক সাধনা! প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করার সাধনা। আগামিকাল ভোরের সূর্যের প্রথম তাপ শরীরে নিয়ে ঘরের দরজা খুলবেন জবালা। এইভাবে চলে আসছে বছরের পর বছর। আমৃত্যু চলবে এই যৌবনের উন্মাদনা। বার্ধক্যে ভারি ভয় জবালার। একদিন সে খুঁজে পেয়েছিল এই বৃদ্ধাকে এক গুপ্ত সম্মেলনে। কেউ যার অস্তিত্বে সজাগ নয়, সে গুপ্ত সম্মেলনে জবালার যাওয়া হয় না। সেখান থেকেই আসে ওষুধ! এই তেলের কথা জানেন জবালা। এই তেল তৈরি হয় জীবিত মানুষের শরীর নিষ্কাসন করে।

আজ বাড়ির মধ্যে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে, সে বিষয়ে অজ্ঞ জবালা যৌবনের উপবনে উপস্থিত হতে চেয়ে নিজেকে সাজাতে থাকেন।

(ক্রমশ)

যেখানে পথ বেঁকেছে

দেবপ্রিয়া সরকার

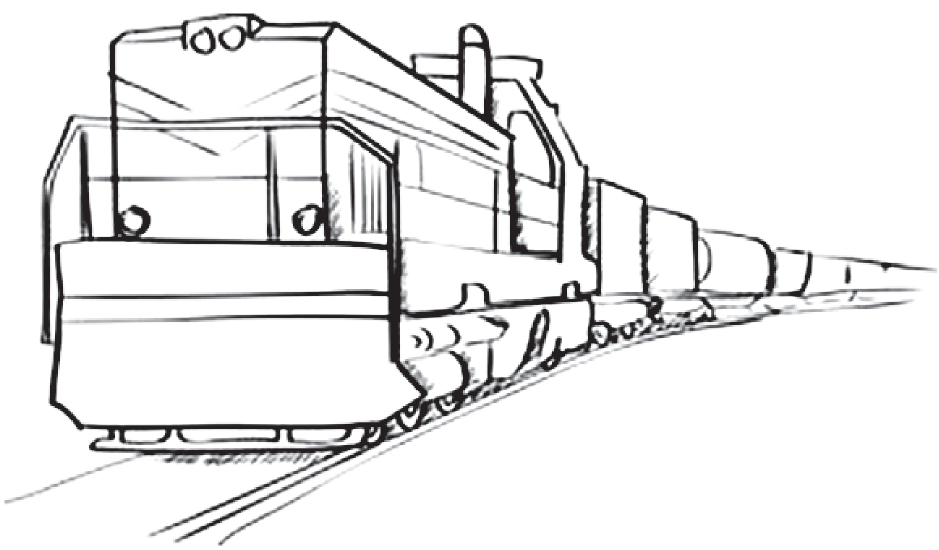

জানালাটা খুলতেই চোখে পড়ল একটা ফাঁকা স্টেশন। ট্রেনটা বেশ কিছুক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছে এখানে। পুবের আকাশে সূর্য উঠব উঠব করছে। কব্জি উল্টে দেখে নিলাম ঘড়িটা। সাড়ে পাঁচটা। একটু তফাতে থাকা হলদে রঙের সাইনবোর্ডে লেখা স্টেশনের নাম। ভালুকা রোড।

বেশ মজার তো নামটা! মনে আছে, সেবার সাগ্নিকের সঙ্গে জয়দেব কেঁদুলির মেলায় যাবার সময়ও এমনই কিছু মজার মজার স্টেশনের নাম দেখেছিলাম। চিফ এডিটর অজয় মুখুটি আমাকে আর সাগ্নিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই বিখ্যাত বাউল মেলা নিয়ে একটা স্পেশাল ফিচার লেখার। বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে উঠে বসেছিলাম দুজনে। বর্ধমান পেরনোর পরই চোখে পড়ল অদ্ভুত অদ্ভুত নামের কয়েকটা ছোট স্টেশন। ঝাপটের ঢাল, পিচকুরির ঢাল, নোয়াদার ঢাল, ভেদিয়া। খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। ডায়রিতে নোট করে রেখেছিলাম নামগুলো। ভালুকা দেখেই আবার মনে পড়ে গেল সেসব পুরনো কথা।

সাগ্নিকটা এবারও থাকলে ভাল হত। আমাদের দুজনেরই যাবার কথা ছিল মিশন উত্তরবঙ্গে। যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে চলেছি সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তরাই-ডুয়ার্সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মানুষদের সংস্কৃতি, উৎসব, লোকাচার নিয়ে একটা কমপ্লিট স্টোরি। আমি আর সাগ্নিক অনেকদিন থেকে বেশ কিছু হোমওয়ার্ক করেছি সাবজেক্টটা নিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ফিল্ড ওয়ার্কে আমাকে একাই আসতে হল। সাগ্নিককে আজই যেতে হবে পুরুলিয়া। জঙ্গলমহল নিয়ে একটা প্রজেক্টের দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন অজয়দা। অনেকটা রাস্তা একসঙ্গে চলার পর আচমকাই বেঁকে গেল দু'জনের পথ। আমি যখন উত্তরমুখী ট্রেনে, ও তখন চলেছে পশ্চিম দিকে!

আসার আগে সাগ্নিক বারবার করে এমনকি কাল অনেক রাত পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেও বলেছে,

—মনে রাখিস সৃজা, অজয়দা ইচ্ছে করে তোকে এই চ্যালেঞ্জটা দিয়েছেন। উনি চাইছেন তোর এফিসিয়েন্সিটা একবার ঝালিয়ে নিতে। কোনওভাবেই এই সুযোগটা হাতছাড়া করবি না। দেখতেই তো পাচ্ছিস একটার পর একটা ম্যাগাজিন ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে। জনপ্রিয় বিভাগগুলো ছাড়া সব প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছে মালিকপক্ষ। এই ফিল্ডে টিকে থাকতে হলে সিরিয়াসলি একসেপ্ট করতে হবে চ্যালেঞ্জগুলোকে। আর নিজের একশো ভাগ দিয়ে কাজটা নামাতে হবে। ধরে নে এটা অজয়দার দেওয়া একটা গুগলি। আর তোকে স্টেপ আউট করে ছক্কা হাঁকাতে হবে। ঠিক সৌরভের 'বাপি বাড়ি যা স্টাইলে'। যদি একটু হিসেবে ভুল হয় তাহলেই ব্লান্ডার। আমি এখান থেকে যতটা সাহায্য করার নিশ্চয়ই করব। অল দ্য বেস্ট।

বড্ড মিস করছি সাগ্নিককে। জার্নালিজম পাশ করে প্রথম যখন পত্রিকায় যোগ দিই তখন থেকেই বন্ধুত্ব সাগ্নিকের সঙ্গে। সিনিয়র হয়েও সবসময় আগলে রেখেছে আমাকে। ভাল কাজ করলে যেমন প্রশংসা করে, আবার ভুল হলে বকাবকি করতেও ছাড়ে না।

এখন পুরদস্তুর টুরিস্টের সিজন। অনেক কষ্টে সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারে একটা রিজার্ভেশন পেয়ে উঠে পড়েছি কামরূপ এক্সপ্রেসে। আশপাশের লোকজনের তেমন ঘুম ভাঙেনি। এটাই ফ্রেশ হয়ে নেবার সঠিক সময়। ট্রেনটাও ঢিমে তালে চলতে শুরু করেছে ভালুকা স্টেশন ছেড়ে। ঘণ্টা তিনেক লেটে চলছে। কতটা দেরি হবে পৌঁছতে কে জানে?

ফিরে এসে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসলাম। চায়ের নেশাটা একটু করে জানান দিচ্ছে এবার। ট্রেনের গতিও বেড়েছে অনেকটা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর দেখা পাওয়া গেল এক চা ওয়ালার।

—দাদা, একটা লাল চা দেবেন।

কেটলি থেকে ধোঁয়া ওঠা চা ঢেলে মাটির ভাঁড়টা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন মাঝবয়সী চা বিক্রেতা। আমি ভাঁড়টা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলাম,

—কত দেব দাদা?

উনি হাসি মুখে বললেন,

—দশ টাকা।

—এক ভাঁড় লাল চা দশ টাকা! কী বলছেন?

লোকটি কৌতুকের হাসি হেসে বলল,

—দিদি এখন দশ টাকায় পাচ্ছেন। আর একটু পরেই এক ভাঁড় চায়ের জন্যে কুড়ি-পঁচিশ টাকাও দিতে হতে পারে।

—মানে?

বিস্ময়ে থমকে গেলাম আমি। ট্রেনটাও মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফাঁকা মাঠের মাঝখানে।

২

পুরো কমপার্টমেন্ট শুদ্ধ লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেই চা বিক্রেতার দিকে। যারা সাতসকালের ঘুমটা এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাইছিল না, তারাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে যার যার সিটে।

কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে তিনি বলে চলেছেন,

—সামনেই বারসোই স্টেশন। সেখান থেকে আমার এক বন্ধু মোবাইলে ফোন করেছিল। সেও আমার মত ট্রেনের হকার। ডিম ফেরি করে। জানাল প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে ওখানে। ছ'টার থেকে শুরু হয়েছে রেল রোকো।

একজন কমবয়সী ছেলে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল,

—কথা নেই বার্তা নেই রেল রোকো! তা কারণটা কী? আর কতক্ষণই বা চলবে?

—সে আমি কীভাবে জানব দাদাভাই? আমরা সাধারণ হকার। আমার সেই বন্ধুটিও কারণ বলতে পারল না। পরে একবার ফোনে ওকে ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু সিগন্যাল পাচ্ছি না। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর গতি নেই।

এবার আর এক জন যাত্রী বলে উঠল,

—এতো আচ্ছা মুশকিল হল! আমার একটা জরুরি মিটিং আছে শিলিগুড়িতে বারটার সময়। একে ট্রেন প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেটে চলছে তার মধ্যে এসব অবরোধ টবরোধ! উফ, মেজাজটাই বিগড়ে

গেল!

একে একে অনেকেই নিজেদের অসুবিধার কথা ফলাও করে বলতে লাগল। দেশের আইন কানুন ব্যবস্থার প্রতি ঘোর অনাস্থার কথাও শোনা গেল কারও কারও মুখে। দু'একজন গলা চড়িয়ে বলল,

—আরপিএফগুলো গেল কোথায়? ওদের দেখছি না তো! টিটিই-টারও তো টিকি নেই!

সেই কমবয়সী ছেলেটির গলা এখনও উত্তেজিত,

—দেখুন গে হয়ত এসি কামরায় বসে হাওয়া খাচ্ছে। তার চেয়ে বরং চলুন আমরা একবার গার্ডের কাছে যাই। শুনে আসি ঘটনাটা ঠিক কী। অনেকক্ষণ থেকে ট্রেনটা এই নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

জায়গাটা সত্যিই জনশূন্য। দু' পাশে ফাঁকা ধান খেত। একটু দূরে আমবাগান। বিপদের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার ওপর আছে খাবার আর জলের প্রশ্ন। অবরোধ কতক্ষণ চলবে তাই বা কে জানে? এতগুলো মানুষ রয়েছে। অনেকের সঙ্গে আবার আছে ছোট ছোট বাচ্চাও। চিন্তার মেঘটা একটু একটু করে ঘিরে ধরছিল আমাকে। সহযাত্রীদের উৎকণ্ঠা, অধৈর্য শিশুদের কান্না এসবের মাঝে কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। ট্রেন থেকে নেমে যাঁরা খবর সংগ্রহে গিয়েছিলেন তাঁরাও ফিরে এসেছেন ইতিমধ্যে। জানা গেল, আগে থেকে কোনও কিছু না জানিয়েই কোনও এক ছাত্র সংগঠন তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে এই অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছে। আপ-ডাউন দু'দিকেই প্রচুর ট্রেন আটকে পড়েছে। রেল কর্তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে তাড়াতাড়ি এই ভোগান্তির নিষ্পত্তি করা যায়। কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই বললেই চলে। ব্যাটারির চার্জও ফুরবে ফুরবে করছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত নেটটা অন ছিল। তখন কি ছাই জানতাম সকাল হলেই এমন দুর্ভোগ কপালে থাকবে? কমপার্টমেন্টের বেশিরভাগ চারজিং পয়েন্টই অকেজো। নামকেওয়াস্তে লাগানো আছে। যে দু' একটা কাজ করছে সেখানে কর্পোরেশনের কলের জল নেওয়ার লাইনের থেকেও বেশি ভিড়। ভীষণ আফসোস হচ্ছে এটা ভেবে যে, সঙ্গিক বারবার বলা সত্বেও এখনও একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনে উঠতে পারলাম না। এবার কিনতেই হবে।

এই উটকো বিপদের কথাটা কি একবার সাগ্নিককে জানানো উচিৎ? অবশ্য জানিয়ে হবেটাই বা কী? ও হয়ত এতক্ষণে পুরুলিয়ার পথে রওনা হয়েছে। এই বিহার-বাংলা সীমান্তে কোনও এক অজানা জায়গায় ট্রেন অবরোধে আটকে পড়া আমার জন্যে কী-ই বা করতে পারবে ও? তার থেকে বরং সুতপাকে একটা ফোন করি। এতক্ষণে তো আমার পৌঁছে যাবার কথা ছিল। বেচারা খুব চিন্তা করছে বোধহয়। ফোনে আমাকে ধরার চেষ্টাও হয়ত করছে। দেখি এই টিমটিমে নেটওয়ার্কে কল যায় কিনা? দু' একবার ব্যর্থ হবার পর অবশেষে লাগল লাইনটা।

—হ্যাঁ সুতপা শুনতে পাচ্ছিস?

—সৃজা? কোথায় তুই?

ওপাশ থেকে ভাঙা ভাঙা গলা ভেসে এল সুতপার।

—একটা বিপদ হয়েছে রে। আমি অবরোধে আটকে পড়েছি।

—কী পড়েছিস? ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। একটু জোরে বল।

—বলছি যে, আমি রেল অবরোধে আটকে পড়েছি। কখন পৌঁছব জানি না।

খুব জোর চেঁচিয়ে কথাগুলো বললাম। আশেপাশের লোকজন একটা বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা একটু হলেও সফল হয়েছে। ওপাশ থেকে সুতপা জিজ্ঞেস করল,

—অবরোধ? কোথায়? এনজেপি পৌঁছেছিস?

—না রে এখনও তো...

কথাটা শেষ করার আগেই ফোনটা কেটে গেল। আবার নো সিগন্যাল।

৩

একা একা রেল যাত্রা খুবই বোরিং। তাই সময় কাটাবার জন্যে হাওড়া স্টেশনের হুইলার্স বুক স্টল থেকে বেশ কিছু পত্রিকা কিনে এনেছিলাম। সঙ্গে ছিল চেতন ভগতের নতুন নভেলটাও। ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই ডুবে ছিলাম সেসব নিয়ে। মাঝে মাঝে চলছিল মোবাইলে খুটখাট। আশপাশের লোকজনকে তেমন খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন এই বিপদের সময় বইপত্র সব মাথায় উঠেছে। ফোনটাও বিট্রে করছে মোক্ষম সময়ে। অগত্যা সহযাত্রীদের কার্যকলাপ অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া কোনও গতি নেই। সেই যে কমবয়সী ছেলেটা বেশ নেতা নেতা হাবভাব করে যাত্রীদের নিয়ে গার্ডের কাছে দরবার করতে গিয়েছিল, লক্ষ্য করছিলাম কিছুক্ষণ ধরে সে আঁতিপাঁতি করে কী যেন খুঁজে চলেছে। উল্টো দিকে বসা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন,

—কী হল? খুঁজে পেলেন?

ছেলেটি নিরাশ হয়ে বলল,

—নাহ। কে ঝাড়ল ঠিক বুঝতে পারছি না।

অন্য আর একজন যাত্রী বললেন,

—পকেট থেকে বেখেয়ালে পড়ে যায়নি তো?

—মনে তো হয় না। এতদিন থেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। আজই হঠাৎ পড়ে যাবে?

কথাগুলো কেমন হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছিল। আমার মত আরও কয়েকজন উৎসুক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ঘটনাটা ঠিক কী জানার জন্য। একটু দূরে বসা একজন যাত্রী ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করেই বসলেন,

—কী হল ভাই? কিছু হারিয়েছে তোমার?

ছেলেটি কাঁদো কাঁদো মুখে বলল,

—হ্যাঁ। আমার নতুন মোবাইল হ্যান্ডসেটটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কী! শেষ কখন দেখেছিলে?

—গার্ডের কাছে যাবার আগে একবার বের করেছিলাম। পরক্ষণেই আবার পকেটে ঢুকিয়ে নিই। ওখানে কথাবার্তা বলার সময়ই খোয়া গিয়েছে মনে হচ্ছে।

—দামী ছিল?

—সে আর বলতে? বিদেশি কোম্পানির নতুন লঞ্চ হওয়া মডেল। তার থেকেও বড় কথা আমার অনেক দরকারি নম্বর, তথ্য সব ছিল ফোনটাতে।

কথাটা শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার। জিন্সের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলাম আমারটা জায়গা মত আছে তো? ছেলেটার জন্যে খারাপ লাগছিল। বেচারা সবার হয়ে কথা বলতে গিয়েছিল গার্ডের সঙ্গে। মাঝখান থেকে এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের ইন্টারভিউ পড়ছিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এখন মোবাইল ছাড়া জীবন অনেকটা চশমাবিহীন চালশে ধরা চোখের মত"। কথাটার মধ্যে এতটুকুও ভুল নেই।

আমার পাশে দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক। কী একটা অচেনা ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলেছেন অনর্গল। বোধহয় নর্থ-ইস্টের কোনও ভাষা হবে। উল্টো দিকে বসে আছেন এক দম্পতি আর একটি বাচ্চা ছেলে। আসার সময় মা-বাবা বারবার করে বলে দিয়েছে, ট্রেনে কোনও সহযাত্রীর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে যাবি না। আর খাবার অফার করলে তো ভুলেও তা যেন ছুঁবি না। একা একা যাচ্ছিস। যা সব ঘটনার কথা শুনি। চুপচাপ নিজের মতন থাকবি।"

সেসব কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি এতক্ষণ। নেটওয়ার্ক ফিরে এলে একবার বাড়িতে ফোন করতে হবে। আমার ফোনের অপেক্ষায় চাতক পাখির মত বসে আছে মানুষ দুটো। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে জরিপ করতে থাকা সামনের সিটের ভদ্রমহিলা নিজের কৌতূহল আর চাপতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন,

—তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই? একাই যাচ্ছ? নামবে কোথায়?

এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে শুনে একটু হকচকিয়ে গেলাম। তারপর ভেবে চিন্তে উত্তর দিলাম,

—আমি একাই। ডুয়ার্স যাচ্ছি। ময়নাগুড়িতে নামব।

ভদ্রমহিলার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

—ডুয়ার্সে কি বেড়াতে যাচ্ছ? নাকি আত্মীয়ের বাড়ি?

এই চরম দুঃসময়ে এমন খেজুরে আলাপ একেবারেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু উত্তর না দেওয়াটাও অশোভন। তাই দায়সারা ভাবে বললাম,

—বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। বেড়ানো আর কাজ দুটোই উদ্দেশ্য।

—আপনি কী কাজ করেন?

এবার প্রশ্নকর্তা ভদ্রমহিলার স্বামী। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোক ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তার চোখ দুটো ঘোরাফেরা করছে আমার সারা শরীরে। গলার স্কার্ফটাকে সামনে টেনে বললাম,

—সাংবাদিক।

আমার পেশার কথা শুনে হয়ত একটু থমকালেন ভদ্রলোক। তাই আর বেশি ঘাঁটালেন না আমাকে। এদিকে পেটের ভেতর কয়েকশ ছুঁচো দৌড়চ্ছে। রাতে মায়ের বানিয়ে দেওয়া পরোটা ঘুগনি সেই কখন হজম হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে এক প্যাকেট বিস্কিট ছিল সেটাও প্রায় শেষ। বোতলের জলও তলানিতে ঠেকেছে। ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভাঙার মুখে। দেখতে দেখতে সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চলল। কমপার্টমেন্ট ভর্তি লোকজনের ক্যাচরম্যাচর, বাচ্চাদের কান্না। সব মিলিয়ে এক চরম খারাপ অবস্থায় কাটছিল সময়। বসে থেকে থেকে কোমরটাও টনটন করছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল সামনের ভদ্রমহিলা টিফিন বাক্স খুলে গুঁড়ের নাড়ু আর চিঁড়ের মোয়া দিচ্ছেন তাঁর স্বামী পুত্রকে। আমাকেও সাধলেন। কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল পিতামাতার দেওয়া উপদেশ। হাসিমুখে বললাম,

—না না আপনারা খান। আমার খিদে পায়নি।

আজ প্রথমবার এমন নিখাদ একটা মিথ্যে বলে মনে মনে প্রচুর আফসোস হচ্ছিল। রোদ তেমন ছিল না। মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছে। মোটের ওপর ভালই ছিল আবহাওয়াটা। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ভদ্রমহিলা জানালেন, তাঁরা যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ার। স্বামীর চাকরির খাতিরে থাকতে হয় ওখানে। আদতে বনগাঁর বাসিন্দা। ছেলের পড়াশুনা, স্বামীর কাজকর্ম ইত্যাদি নানা গালগল্পে কাটল আরও বেশ কিছু সময়। প্রথমটায় বিরক্ত লাগলেও এখন আর ততটা খারাপ লাগছে না কথাগুলো শুনতে। সময়টা তো কাটছে।

আচমকাই কোথা থেকে একটা দেহাতী চেহারার লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে ময়লা চিটচিটে ফতুয়া, ততধিক নোংরা খাটো ধুতি যেটার রং কোনও একসময় হয়ত সাদা ছিল। গলায় গামছা ঝুলছে। কানে দুল, দু'হাতে উল্কি আঁকা। কাঁচা-পাকা চুল তেল দিয়ে উল্টে আঁচড়ানো। কপালে লম্বা সিঁদুরের টিপ। পান, গুটকা খাওয়া লালচে ছোপ পড়া দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। হাতে একটা ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি। চম্বল ফেরত ডাকু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। দুরু দুরু বুকে সেঁটে গেলাম জানালার সঙ্গে। থমথমে পরিবেশ। ভাবছিলাম এই বুঝি বের করল ভোজালি অথবা রাম দা জাতীয় কিছু! ছিনিয়ে নিল যার কাছ থেকে যা পারে!

কিন্তু না, তেমন কিছুই ঘটল না। তবে যেটা হল সেটাও কম বিপদজনক নয়। সেই মিতভাষী মানুষটি আলতো করে সরাল ঝুড়ির ঢাকাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির ভেতর ফণা তুলে জেগে উঠল মাথায় চক্র আঁকা বিরাট একখানা গোখরো সাপ! ভয়ে সকলের চোখ কপালে! লোকটির পাশে বসা এক যাত্রী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন,

—আরে একী! সাপ নিয়ে ট্রেনে উঠেছ? বন্ধ কর শিগগিরি। এটা বেরিয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে!

লোকটা নির্বিকারে ঝুড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে দেখাল। তারপর বন্ধ করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। পাঁচ টাকা, দশ টাকা যে যা পারল দিয়ে দিল তার হাতে। ট্রেনযাত্রীদের কাছ থেকে অনেককে অনেক উপায়ে টাকা নিতে দেখেছি। কেউ রং মেখে সং সেজে উপস্থিত হয়। কেউ শোনায় মন ভাল করে দেওয়া বাউল অথবা লোকগান। কিন্তু ভয় দেখিয়ে টাকা চাইতে এই প্রথমবার দেখলাম!

দুপুর বারটা নাগাদ কামরাশুদ্ধ যাত্রীদের মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা গেল। খবর এল অবরোধ উঠেছে। এবার ছাড়বে ট্রেন। ইঞ্জিনের হুইসল শুনে সকলের শুকনো মুখে ফুটল হাসি। ট্রেন ছাড়ল বটে কিন্তু একটু পরপরই থামতে হল ক্রসিঙের জন্যে। পেটের ভেতর জ্বলতে থাকা আগুনটায় ছিটেফোঁটা গঙ্গা জলের মত পড়েছে শুধু এক ঠোঙা ঝালমুড়ি আর দু' চারটে লেবু লজেন্স। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পাক্কা বার ঘণ্টা দেরিতে চলছে ট্রেন। দু' চারবার লো ব্যাটারির রিমাইন্ডার দিয়ে ফোনটাও সুইচ অফ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বন্ধ হবার আগে একবার সিগন্যাল পেয়েছিলাম। তখন মায়ের সঙ্গে শুধু কথা হয়েছে দু' মিনিটের জন্যে। আমি ঠিক আছি জেনে ধড়ে প্রাণ এসেছিল মায়ের। সাগ্নিকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

শরীরটা আর সঙ্গ দিচ্ছে না। খাবার দেখলে গা গুলোচ্ছে। একবার ভাবলাম এনজেপি-তেই নেমে যাই। শিলিগুড়িতে কোনও হোটেলে রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালে চলে যাব সুতপাদের বাড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম। যত দুর্ভোগ কপালে আছে সব আজই সহ্য করব। অচেনা জায়গায় বিপদ ওত পেতে থাকে। দেখা যাবে এক ঝামেলা থেকে বাঁচতে গিয়ে আবার নতুন কোনও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ট্রেন চলতে শুরু করল। সামনের সিটের ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পর আবার কথা বললেন,

—আপনার আর খুব বেশি সময় লাগবে না। ঠিক মত চললে এক দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। ঝামেলা হবে আমাদের। আলিপুরদুয়ারে নেমে আবার যেতে হবে বেশ খানিকটা, সেই সলসলাবাড়ি।

সলসলাবাড়ি! অন্য সময় হলে এই নামটাও লিখে রাখতাম ডায়রিতে। কিন্তু এখন আর কিছুই ভাল লাগছে না। এনার্জি লেভেল একদম বর্ডার লাইনে। গোধূলির ম্রিয়মাণ আলোর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি আমার গন্তব্যের। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পেরতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। সুতপার কথা মত এর পরের স্টপেজটাই ময়নাগুড়ি, আমার ডেসটিনেশন।

এতক্ষণ কানে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আর দু একটা শেয়াল, কুকুরের হাঁক ডাকই আসছিল। এবার বাড়তি একটা শব্দ যোগ হল। বুকটা আচমকাই কেঁপে উঠল আমার। হ্যাঁ, কেউ হেঁটে আসছে বলেই তো মনে হচ্ছে! পায়ের শব্দ! সন্তর্পণে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পেছন দিকে। চাপ চাপ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ টর্চের আলো আমাকেই অনুসরণ করছে।

৪

সন্ধে সাতটা নাগাদ নামলাম প্রায় শুনশান প্ল্যাটফর্মে। নামার সময় সামনের সিটের সেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। সিটের নিচে রাখা ট্রলি ব্যাগটা বের করতে একটু কসরত করতে হচ্ছিল আমাকে। শুধু বের করা নয়, আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে গেট পর্যন্ত এগিয়েও দিলেন ব্যাগটা। জানি না তাঁর এই উপকারের পেছনে আদৌ কোনও উদ্দেশ্য ছিল কিনা। যদি থাকেও সেটা তিনিই একমাত্র জানেন। ভদ্রলোককে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমার। বিনিময়ে তিনি আমাকে দিলেন এক চিলতে হাসি।

প্ল্যাটফর্মের শেষে একটা বাঁক নিয়েছে রেললাইনটা। বেঁকে যাওয়া পথ দিয়ে আপন ছন্দে এগিয়ে চলল ট্রেন। আমার সঙ্গে আরও জনা তিন চারেক যাত্রী নেমেছিলেন। কয়েকটা রিকশা বা টোটো চালক গোছের লোক বলে চলেছে দেবীনগর, সুভাষনগর, আনন্দনগর, হাসপাতাল পাড়া, বাগজান। আমার সামনেও এগিয়ে এল একজন। ততক্ষণে আমার মাথা 'ঘেঁটে ঘ'! কী যেন বলেছিল সুতপা পাড়ার নামটা? কিছু একটা নগর যে ছিল সেটা কনফার্ম। কিন্তু কী নগর? দেবী, সুভাষ নাকি আনন্দ? উফ! ফোনের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে সেই রিকশাচালক ভাইও চলে গেল প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

আজকাল সব ফোন নম্বর মোবাইলেই সেভ করা থাকে। তাই আলাদা করে কোথাও লিখে রাখা বা মুখস্থ করে নিজের মেমরি ব্যাঙ্কে স্টোর করে রাখার অভ্যেসটাই চলে গিয়েছে। না হলে আশেপাশে কারও ফোন থেকে সুতপাকে একটা কল করা যেত। কিছুক্ষণ হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মনে পড়ল সুতপা একটা শর্টকাট রাস্তার কথা বলেছিল,

"রিকশা বা টোটোতে এলে অনেক ঘুরতে হবে। তার থেকে বরং তুই হাঁটা পথে আসবি। সকাল সকাল পৌঁছবি তো, কোনও অসুবিধা হবে না। ওভারব্রিজ পেরিয়ে দু' নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দেখবি এক জায়গায় ব্যারিকেডটা ভাঙা আছে। সেখান দিয়ে নেমে সোজা হাঁটতে থাকবি। কিছুটা হাঁটার পর প্রথম যে বাড়িটা পাবি, সেটাই আমাদের রায়বসুনিয়া ভিলা। আমরা স্টেশন থেকে এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করি। যদি কোনও সমস্যা হয় তবে ফোন তো আছেই। একটা কল করবি। আমি নিজে গিয়ে তোকে নিয়ে আসব।"

হায় আমার দুর্ভাগ্য! এখন না আছে দিনের আলো! না আছে ফোন! অগত্যা সময় নষ্ট না করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম ওভারব্রিজের দিকে। দু' চারটে ভবঘুরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। গোটা কয়েক কুকুরও ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। তার মধ্যে কেউ কেউ আমাকে দেখে সজোরে ডেকে উঠল। দু' নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। হ্যাঁ ঠিকই, এক জায়গায় ব্যারিকেডটা ভাঙা রয়েছে। সেখানে গিয়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ! ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা অন্ধকার ফাঁকা জমির মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে। মানুষ যাতায়াত করে বোঝা গেল। প্রায় কিলোমিটার দেড়েক দূরে চোখে পড়ল জ্বলে থাকা টিমটিমে আলো। ওটাই তবে সুতপাদের বাড়ি।

সারাটা দিন প্রচুর দুর্ভোগ গিয়েছে। স্নান, খাওয়া, ঘুম কিছুই হয়নি ঠিক মত। তারপর আবার এতটা পথ অন্ধকারে হাঁটতে হবে! হে ঈশ্বর! আর কত পরীক্ষা নেবে? অজয়দা তো শুধু গুগলি দিয়েছেন কিন্তু ওপরওয়ালা আমাকে হেলমেট, গ্লাভস, প্যাড ছাড়াই একা মাঠে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষ বোলারদের কঠিন আক্রমণ সামলানোর জন্যে!

অযথা সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লাম। যতক্ষণ প্ল্যাটফর্মের আলোর ছটা আসছিল। ততক্ষণ ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলাম রাস্তাটা। কিন্তু একটু দূর আসতেই অন্ধকার ঘিরে ধরল আমাকে। আলোর উৎস বলতে ছিল উড়তে থাকা অজস্র জোনাকি। অনেকদিন পর এত জোনাকি একসঙ্গে দেখলাম। কিন্তু কোনও রোমাঞ্চ হচ্ছিল না। একে বিধ্বস্ত শরীর, তার ওপর বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। আবার এক প্রস্থ রাগ হল মোবাইলের ওপর।

ওটাতেই টর্চ থাকে। তাই আজকাল আর আলাদা করে টর্চ ব্যবহার করি না।

চারপাশে আগাছার জঙ্গল। বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপখোপ থাকা অসম্ভব কিছু না। মনের মধ্যে এখনও তরতাজা ট্রেনে দেখা সেই গোখরোর স্মৃতি! মাঝে মাঝে কাগজে উত্তরবঙ্গের ঝোপে ঝাড়ে চিতা বাঘ লুকিয়ে থাকার খবরও বের হয়। কী জানি এই জংলা জায়গায় সেও আছে কিনা ঘাপটি মেরে! ভয়ে, ক্লান্তিতে গলা শুকিয়ে আসছিল। সঙ্গের ট্রলি ব্যাগ, রুকস্যাক দুটোই বেশ ভারী। সেগুলো টেনে চলার ক্ষমতাও আর বিশেষ পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল এই আগাছার জঙ্গলেই বসে পড়ি।

৫

এতক্ষণ কানে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আর দু একটা শেয়াল, কুকুরের হাঁক ডাকই আসছিল। এবার বাড়তি একটা শব্দ যোগ হল। বুকটা আচমকাই কেঁপে উঠল আমার। হ্যাঁ, কেউ হেঁটে আসছে বলেই তো মনে হচ্ছে! পায়ের শব্দ! সন্তর্পণে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পেছন দিকে। চাপ চাপ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ টর্চের আলো আমাকেই অনুসরণ করছে। যখন কোনও কিছু নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি তখন অনেক অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস মাথায় আসে। যেমন এই মুহূর্তে আমার একটা সিনেমার ডায়লগ বারবার মনে পড়ছে। সেই যে শাহিদ-করিনার বহুবার দেখা সিনেমাটা, 'জব উই মেট'। সেখানে এক জায়গায় একটা বাক্য ছিল, "অকেলি লড়কি খুলি হুই তিজোরি কি তরহা হোতি হ্যায়!" আমার কাছে এই মুহূর্তে বেশ কিছু দামী দামী জিনিস আছে। আঠারোতম জন্মদিনে বাবার দেওয়া হিরের আংটি, একটা ভাল কোম্পানির ল্যাপটপ, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফার্স্ট্র্যাকের লেটেস্ট মডেলের হাত ঘড়ি, দামী মোবাইল এবং পার্সে হাজার ছয়েক টাকা ক্যাশ। যদি সত্যিই আমার ওপর কেউ হামলা করে তবে তারা কি শুধু এই পার্থিব জিনিসগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? কারণ এর বাইরেও তো একটা বস্তু আছে আমার কাছে। এই নারী শরীর। যার সম্ভ্রমকে লুট না করলে তো লুটেরাদের পুরুষ সত্ত্বার ভয়ংকর মানহানি হবে!

রুকস্যাকের বেল্টটা আরও আঁট করে শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিলাম। টর্চের আলোটা ক্রমশ কাছে আসতে আসতে ধরে ফেলল আমাকে। আমি দ্রুত পা চালাচ্ছি। কিন্তু আমার ওই কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীর গতি আমার থেকেও অনেক বেশি। একদম পাশে চলে এসেছে লোকটা। টর্চের আলোটা এবার আমাদের সামনের পথটাকে আলোকিত করে রেখেছে। আড়চোখে একবার বাঁদিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। মনে হল একজন বয়স্ক মানুষ। কিন্তু তাতে কী? চোর, ডাকাতের আবার কোনও রিটায়ারমেন্টের বয়স থাকে নাকি? দুরু দুরু বুকে নিঃশব্দে হেটে চলেছি।

—কার বাড়ি যাবে?

স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলেন তিনি। প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়ে ছিলাম। তারপর একটু সময় নিয়ে বললাম,

—রায়বসুনিয়াদের বাড়ি যাব।

—ও সোমুদা মানে সোমনাথ রায়বসুনিয়ার বাড়ি যাচ্ছ?

দ্বিতীয় প্রশ্নটা শুনে একটু স্বস্তি পেলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমনটা বোধহয় নয়। চোর, ডাকাত না মনে হয়। কোনও ভদ্রলোকই হবে হয়ত।

—হ্যাঁ ঠিক। ওঁর বাড়িতেই যাচ্ছি।

—কে হন তোমার সোমুদা?

—আত্মীয়, কুটুম নন। ওঁর ছোট মেয়ে সুতপা আমার বন্ধু।

—আচ্ছা আচ্ছা। সুতপা তো কলকাতায় পড়াশুনা করত। তোমাকেও তো এই অঞ্চলের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে কি কলকাতা থেকেই আসছ?

—একদম ঠিক ধরেছেন আপনি।

—কিন্তু মা তুমি ব্যাগপত্র নিয়ে এই হাঁটা পথে কেন এসেছ? সঙ্গে টর্চও নেই দেখছি?

বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের গলার স্বরে একটা বেশ আন্তরিকতার ছোঁয়া পাচ্ছিলাম। বললাম,

—আর বলবেন না! আজ সারাদিন দুর্ভোগের একশেষ! রেল অবরোধে আটকে পড়েছিলাম। বার ঘণ্টা লেটে ঢুকল কামরূপ এক্সপ্রেস। সারাদিন ফোন চার্জ হয়নি। তাই সুইচ অফ হয়ে গিয়েছে। পাড়ার নামটা কী যেন ছিল? গুলিয়ে ফেলেছি। ফোন করে যে শুনব তারও উপায় নেই। কিন্তু সুতপা এই শর্টকাট রাস্তাটার কথা বলে দিয়েছিল আমাকে। সেটা মনে পড়ায় এই রাস্তা ধরেই এগোতে লাগলাম। ঠিক পথে যাচ্ছি তো?

আমার কাছে এই মুহূর্তে বেশ কিছু দামী দামী জিনিস আছে। আঠারোতম জন্মদিনে বাবার দেওয়া হিরের আংটি, একটা ভাল কোম্পানির ল্যাপটপ... যদি সত্যিই আমার ওপর কেউ হামলা করে তবে তারা কি শুধু এই পার্থিব জিনিসগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? কারণ এর বাইরেও তো একটা বস্তু আছে আমার কাছে। এই নারী শরীর। যার সম্ভ্রমকে লুট না করলে তো লুটেরাদের পুরুষ সত্ত্বার ভয়ংকর মানহানি হবে!

—হ্যাঁ মা ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছ। আমার নাম হরেন লাহা। স্টেশনের পাশেই আমার ছোট গালামালের দোকান। আসলে আমরা যারা এদিকটায় থাকি তাদের পক্ষে এই রাস্তাটাই সহজ। না হলে অনেকটা ঘুর পথে যেতে হয়। তাই হয়তো সুতপা মা তোমাকে এটার কথা বলেছিল। দিনেরবেলা তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু রাতের দিকে পোকামাকড়ের ভয় থাকে। তাতে আবার গ্রীষ্মকাল। তা তুমি কি বেড়াতে এসেছ?

—না আঙ্কেল। কাজে। লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে পাশ করার পর সুতপা চলে যায় বিএড পড়তে আর আমি জার্নালিজম। তবুও যোগাযোগটা ছিল। আমি এখন যে পত্রিকায় কাজ করছি তারা তরাই-ডুয়ার্সের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মানুষদের জীবনযাপন, লোক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে চাইছে। সেই বিষয়ে কিছু ফিল্ড স্টাডি করতেই আমার এখানে আসা।

—বাঃ বাঃ খুব ভাল।

—আমি ভেবেছিলাম জলপাইগুড়ি বা লাটাগুড়িতে কোনও গেস্ট হাউস বা রিসর্টে থাকব কিন্তু সুতপা বারণ করল। প্রস্তাব দিল ওদের বাড়িতে থাকার। আমিও ভেবে দেখলাম হোটেল বা লজে থাকলে কাছ থেকে স্থানীয় মানুষদের দেখতে পারব না। তাদের সঙ্গে একাত্ম হতেও অসুবিধা হবে। তার থেকে কারও বাড়িতে থাকলে আমি অনেক সহজেই মিশতে পারব সাধারণ মানুষের সঙ্গে। যেটা আমার টার্গেটে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

—ভীষণ খুশি হলাম শুনে যে কলকাতার পত্রিকাগুলোও আজকাল উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছে। তাদের জীবন চিত্রকে তুলে ধরতে চাইছে সারা বাংলার মানুষের সামনে।

—আরে আঙ্কেল আপনি জানেন না, এখন ভারতবর্ষের পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে ডুয়ার্স একটা খুব পরিচিত নাম। প্রত্যেক বছর প্রচুর মানুষ আসেন এখানে বেড়াতে। উপভোগ করেন এখানকার সহজ সরল, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রাকে। তিস্তা-তোর্সার বোরোলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স পর্যটন নিয়ে লেখা পত্রপত্রিকা, বই সব হটকেকের মত বিক্রি হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৈরি হয়েছে বেশ কিছু গ্রুপ। যেখানে নিয়মিত ছবি পোস্ট করা হয় ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গার। লেখা হয় ট্র্যাভেলগও। অনেকে চিঠি লেখেন আমাদের দপ্তরে। জানতে চান তিস্তা বুড়ির পুজো, মেছেনি নাচ সম্পর্কে। অনেকে খোঁজ নেন ভাওয়াইয়া, বিষহরি গানের। কারও কারও উৎসাহ আবার রাভা, টোটোদের জীবন নিয়ে। দলবেঁধে ধামসা, মাদলের তালে তালে চা-বলয়ের আদিবাসী মেয়েদের নাচ। বা ট্র্যাডিশনাল পোশাক ডোকনা পরে মেচ মেয়েদের বৈশাগু সত্রালি নাচ। সব কিছু নিয়েই উৎসাহী আজকের টুরিস্ট। ঘুরতে যাওয়া মনেই নিছক সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের সামনে হাসিমুখে ছবি তোলা আর হোটেলের ঘরে ল্যাদ খাওয়া নয়। সেই জায়গা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা আর নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়ানোটাও উদ্দেশ্য।

—ঠিকই বলেছ মা। দেখতে দেখতে অনেক উন্নত হয়ে গেল আমাদের উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প। শুধু উন্নতি হল না আমাদের এই রাস্তাটারই।

এই নিঝুম রাস্তায় একাকী হাঁটতে যতটা ভয় লাগছিল, এখন একজন সঙ্গী পেয়ে সব কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। ক্লান্তি আছে শরীরে যথেষ্টই তবুও অনেক কথাই বেরিয়ে আসছে আপনা থেকে।

—পঞ্চায়েতকে বলেন না কেন?

—ধুর! ধুর! একবার? অজস্রবার দরবার করেছি। পঞ্চায়েত দেখায় রেলকে, রেল পঞ্চায়েতকে। মাঝখান থেকে ভুগতে হয় আমাদের। কত অভিজ্ঞতা যে হল এই পথে সে আর কী বলব!

৬

ভারি ব্যাগ টেনে টেনে হেঁটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে একবার যদি বসতে পারতাম তাহলে বেশ ভাল হত। সুতপাদের বাড়ির লাইট এখনও খানিকটা দূরে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক বললেন,

—তোমায় একটা গল্প শোনাই। তবে ঠিক গল্প নয়। এই জংলী পথের গল্প। আমার জীবনের

সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা বলতে পারো।

শরীর, মন সবই এবার সঙ্গ ছাড়বে মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় আবার গল্প! হ্যাঁ না কিছুই বললাম না। নিজের ভেতর বেঁচেবর্তে থাকা সবটুকু শক্তিকে নিংড়ে নিয়ে হাঁটছিলাম নিঃশব্দে। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন,

—সেটা সত্তরের সেই অগ্নিগর্ভ সময়। আমাদের পাড়ার সবথেকে ডাকাবুকো ছেলে ছিল অবিনাশদা। আমরা সকলে তাকে ওস্তাদ বলে ডাকতাম। রোগা পাতলা, বেঁটেখাটো চেহারার অবিনাশদার কোনও কাজে না ছিল না। সে রাতবিরেতে মড়া পোড়াতে যাওয়াই হোক, বা বিয়ে বাড়ির খাবার পরিবেশন। সবসময় কোমরে গামছা বেঁধে রেডি। তা কৃষক পরিবারের ছেলে এই অবিনাশদা কীভাবে যেন জড়িয়ে পড়ল নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। আমাদের তখন সবে আঠারো বছর বয়স। ওস্তাদ এসে মাঝে মাঝেই শোনাত কানু সান্যাল, চারু মজুমদারদের আগুন ঝরানো বক্তৃতা। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত। টগবগ করে ফুটত সারা শরীরের রক্ত! তুমি নকশাল আন্দোলনের কথা জানো তো মা?

—হ্যাঁ। বাবা, কাকাদের মুখে শুনেছি। গল্প, উপন্যাসেও পড়েছি। সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' তো আমার খুব প্রিয়।

ক্ষীণ স্বরে বললাম আমি।

—হঠাৎ একদিন অবিনাশদাদের বাড়িতে পুলিশ এল। ততদিনে সে গা ঢাকা দিয়েছে কোনও গোপন ডেরায়। এদিকে বাড়ির বড়রা বলে দিয়েছেন যাতে অবিনাশদার সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করি। না হলে আমাদের হাজতবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেদিন ছিল দীপাবলির রাত। ঘোর অমাবস্যায় চলছিল মা কালীর আরাধনা। আমি পুজোমণ্ডপ থেকে ফিরে সবে শোবার আয়োজন করছি। এমন সময় আমার জানালায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি অবিনাশদা! ক্ষয়াটে শরীর, গর্তে ঢোকা চোখ। সকলে পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকদিন পর ঘরে ফিরেছিল অবিনাশদা। কিন্তু পুলিশও তক্কে তক্কে ছিল। ঘিরে ফেলেছিল ওদের বাড়ি। কোনও রকমে পালাতে পেরেছিল সে। কিন্তু পুলিশের গুলি এসে লেগেছিল বাঁ কাঁধে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিশে কোনও ক্রমে ধুলো দিতে পেরেছিল পুলিশের চোখে। আমার ঘরে আলো জ্বলছিল দেখে এগিয়ে এসেছে সাহায্যের আশায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। ভয়ার্ত স্বরে বললাম,

—তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তো!

কিন্তু অবিনাশদা রাজি হল না। ঠিক হল এই জংলা পথ দিয়ে যাব। এদিকে পুলিশ আসবে না। স্টেশনের কাছে একজন ডাক্তার থাকেন। আপাতত সেখানেই যাওয়া হবে।

এতগুলো কথা বলে একটু থামলেন হরেন লাহা। কিন্তু আমি পুরোটা শুনতে চাইছিলাম। বললাম,

—তারপর?

—প্রায় অচৈতন্য অবিনাশদার হালকা

টর্চের আলো ফেলে সেই দিকে হাঁটতে লাগলেন হরেন লাহা। নিজের বিবেকের কাছে গোহারা হেরেছি আমি। একজন নিপাট ভাল মানুষকে চোর অথবা ডাকাত ভেবে ভয় পেয়েছি অকারণে। আজকাল বড্ড বেশি অবিশ্বাস নিয়ে বাঁচি আমরা। তাই তো মাঝে মাঝে এভাবেই ঠকতে হয় আমদের মত 'অতিসাবধানী', 'প্র্যাকটিকাল' শহুরেদের সহজ সরল প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে।

শরীরটাকে কাঁধে চাপিয়ে, সকলের নজর এড়িয়ে হাঁটা লাগালাম এই পথে। ওর শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তে ভিজছিলাম আমিও। মাথার ওপর ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার আকাশ। পায়ে বিঁধছে কাঁটা, ধারালো পাথরের টুকরো। কিন্তু তখন ওসবের পরোয়া করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। উদ্দেশ্য একটাই, অবিনাশদার প্রাণ বাঁচানো। দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে পৌঁছলাম স্টেশনে। তখন এতো আলো ছিল না, প্ল্যাটফর্মও ছিল নিচু। কোনও ক্রমে সেসব পেরিয়ে এগিয়ে চললাম ডাক্তার সামন্তের বাড়ির দিকে...। নাও তোমার বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

—কোথায়? ডাক্তারের বাড়িতে?

—না না তোমার গন্তব্যে। ওই তো রায়বসুনিয়াদের বাড়ির গেট।

কীসের রায়বসুনিয়া? কে সুতপা? আমার চোখের সামনে শুধু তখন একটাই ছবি। অন্ধকারে এক আহত বিদ্রোহীকে টানতে টানতে আর তার রক্তে ভাসতে ভাসতে এক বন্ধু বা ভাই এগিয়ে চলেছে বিপদকে দু'পায়ে মাড়িয়ে।

আলগোছে একবার সুতপাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। বললাম,

—এরপর কী হল? বেঁচেছিলেন অবিনাশ? পুলিশ খোঁজ পেয়েছিল তাঁর?

একটা শুকনো হাসি হেসে হরেন লাহা বললেন,

—আর শুনে কী করবে সেসব কথা? সেই বিপ্লবও আর নেই, সেই অবিনাশরাও হারিয়ে গিয়েছে কোথায়! এখন এসব নেহাতই গল্পগাথা!

—কিন্তু শেষটায় কী হল জানতে চাই আমি, আঙ্কল।

—তোমার ওপর দিয়ে সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে মা। স্নান খাওয়া, কিছুই তো হয়নি? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। যাও ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, কিছু খেয়ে, বিশ্রাম কর। আর গল্পের কথা বলছ? ওটা না হয় তুমি তোমার মত করে শেষ করে নিও। আমি এখন চলি।

সামনে একটা বড়সড় বাঁশঝাড়। সেখান থেকে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। টর্চের আলো ফেলে সেই দিকে হাঁটতে লাগলেন হরেন লাহা। আর নিজের বিবেকের কাছে গোহারা হেরে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। একজন নিপাট ভাল মানুষকে চোর অথবা ডাকাত ভেবে ভয় পেয়েছি অকারণে। আসলে ছোট থেকেই অবিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে শিখেছি আমরা। তাই তো আমাদের মত 'অতিসাবধানী', 'প্র্যাকটিকাল' শহুরেদের মাঝে মাঝে এভাবেই ঠকতে হয় সহজ সরল প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে।

গেটের ওপর জ্বলছে একটা কম পাওয়ারের সিএফএল। বাঁ দিকের পিলারের ওপর কালো পাথরে সাদা রং দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রায়বসুনিয়া ভিলা। সেখানে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। অপলকে চেয়ে রইলাম সেই বাঁশঝাড়টার দিকে, যেখানে পথ বেঁকেছে।

পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ বৈষম্য !

রাখি পুরকায়স্থ

পরিবারের সদস্যদের দেখেশুনে ও খেলার সাথীদের সাথে মিশে শিশুরা নিজেদের অজান্তেই জীবনের প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে। এরপরই শিশুরা যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেটি হল তাদের বিদ্যালয়। বলতে গেলে বিদ্যালয়েই শিশুরা প্রথম সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা সকলেই জানি, শিশুদের সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারের বাইরে শিশুদের সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ও প্রগতিশীল চিন্তাশক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকেই মানবজীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও আশেপাশের মানুষগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মনে গঠনমূলক ধারণা তৈরি হয়। গড়ে ওঠে মুক্ত চিন্তার বিস্তৃত জগৎ।

তবে চারিদিকে একটু ভাল করে নজর দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, লিঙ্গ নিরপেক্ষ মুক্ত চিন্তার বড় অভাব আমাদের সমাজিক মননে। আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্যের ধারা বহমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষকতা এবং নার্সিং পেশাকে সাধারণত মহিলাদের স্বাভাবিক পেশা হিসেবে দেখা হয়। অথচ ফুটবলার কিংবা পুলিশ বলতে আমাদের মনে ভেসে ওঠে একজন পুরুষের ছবি! এমন সব বাঁধাধরা ধ্যানধারণা হয়ত সমাজ থেকে অবিলম্বে নির্মূল করা সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে এসব মুছে দিয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার সম্ভব। মানব জীবনের প্রারম্ভিক স্তর থেকেই সেই কাজটি অতি নিপুণ হস্তে সম্পাদন করতে সক্ষম আমাদের বিদ্যালয়গুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যবইগুলি কিন্তু অন্য কথা বলে। সেখানে গৃহবধূদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়, পণপ্রথার জন্য নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং সর্বোপরি পুরুষ-শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গাওয়া হয় বারবার। এভাবেই লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার চলছে সুপরিকল্পিত উপায়ে।

সম্প্রতি রাজস্থান শিক্ষা পর্ষদের বিদ্যালয়ের সংশোধিত পাঠ্যক্রমের পাঠ্যপুস্তকগুলির মাধ্যমে আমাদের সমাজে গভীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে থাকা লিঙ্গ বৈষম্যের আরও ব্যাপক প্রচার হতে দেখা গিয়েছে। একটু নজর দিলেই বোঝা যায়, পুরুষ শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে রাজস্থানের ইংরেজি ও হিন্দি পাঠ্যবইগুলির পাতায়। তৃতীয় শ্রেণির একটি হিন্দি পাঠ্যপুস্তকে খেলাধুলো নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি ছবি। ছবি তিনটিতে কেবলমাত্র ছেলেরাই খেলাধুলো করছে। এর মাধ্যমে যে বার্তাটি শিশুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তা হল, খেলাধুলো শুধুমাত্র ছেলেদেরই জন্যে— মেয়েদের জন্যে নয়। একদল শিক্ষা বিশেষজ্ঞ পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে কোনও এক পুরুষের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে মহিলাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, কোনও পুরুষের স্ত্রী, বোন, মা ইত্যাদি। পড়লে মনে হয়, মহিলাদের যেন কোনও স্বাধীন পরিচিতি নেই!

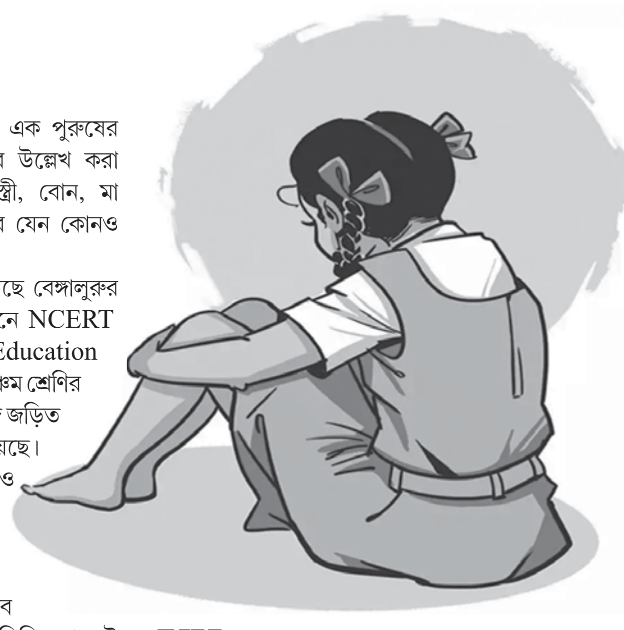

একই ধরনের ঘটনা চোখে পড়েছে বেঙ্গালুরুর একটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে। সেখানে NCERT (National Council of Education Research and Training)-এর পঞ্চম শ্রেণির একটি পাঠ্যবইয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণকাজে জড়িত পাঁচজন ব্যক্তিকে চিত্রিত করা হয়েছে। একজন মহিলা গৃহনির্মাণ কর্মীকেও দেখানো হয়নি সেই ছবিটিতে। আমরা জানি, বহু নারী গৃহনির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত। মাথার ওপর ইট, বালি, সিমেন্ট বহনকারী হিসেবে নির্মাণস্থলগুলিতে তাঁদের সুস্পষ্ট উপস্থিতি কখনওই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। 'শ্রমসাধ্য কাজ কেবলমাত্র পুরুষদেরই জন্যে' —পাঠ্যবইয়ের ছবিতে মহিলা শ্রমজীবিদের অনুপস্থিতি যেন সেই বার্তাই বহন করে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ধ্যানধারণাগুলিকে টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই ছবি।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও অনুরূপ লিঙ্গ বৈষম্যমূলক তথ্য প্রচারের প্রমাণ মেলে। পাঠ্যবইগুলিতে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি অসংখ্য নারী যোদ্ধা ও বিশিষ্ট মহিলা সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকাকে অকিঞ্চিৎকর করে তোলা হয়েছে। গাওয়া হয়েছে পুরুষদের জয়গান। এই ইতিহাস বইগুলিতে নারীদের সামগ্রিক চিত্রটি মূলত সেবিকার। কখনও আবার তাঁদের কোনও এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক, যেমন মা, বোন, মেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদির নিরিখে উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সেইসাথে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে 'নিজের বাড়ির কাজ করেন' এমন পুরুষ চরিত্র মেলা ভার। সেখানে গৃহকর্ম কেবলমাত্র মহিলা চরিত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেখা গেছে, পাঠ্যপুস্তকের কাহিনিগুলিতে মহিলা চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহাভ্যন্তরের পারস্পরিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কেন পাঠ্যবইয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে মহিলা চরিত্রগুলিকে দোকানদার, বাস চালক, ফুটবলার কিংবা পুলিশ অফিসার হিসেবে দেখানো হয় না? ভেবে দেখবার আশু প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এভাবেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি লিঙ্গ বৈষম্যমূলক গতানুগতিক ধ্যানধারণা প্রচার ও প্রসারের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন চলাকালীন শিক্ষকরা এবং বাড়িতে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের কথোপকথন ও আচরণ দ্বারা প্রায়শই এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করেন, যা দেখেশুনে মনে হয় ছেলেরা বিজ্ঞান এবং গণিতে মেয়েদের চাইতে অনেক বেশি পারদর্শী। ভবিষ্যতে যেন ছেলেরাই কেবল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী কিংবা গণিতজ্ঞ হবে। সকলেই ভাবেন, একই পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করলেও মেয়েরা মূলত শিখবে গৃহ বিজ্ঞান এবং হস্তশিল্প। কারণ সমাজ ধরে নিয়েছে, মেয়েরা এদেশের ভবিষ্যৎ গৃহকর্মী। বিভিন্ন রাজ্যের কর্মশিক্ষার পাঠ্যক্রম ঘাঁটলে সহজেই জানা যায়, লিঙ্গ বৈষম্য কতখানি তীব্র। শ্রেণিকক্ষে ও বাড়িতে লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আলাপচারিতা কিংবা এমন দোষে দুষ্ট পাঠ্যক্রম ছোট বাচ্চাদের আচরণকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই গতানুগতিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী পরবর্তী জীবনে তাদের নিজ নিজ লিঙ্গের জন্য সমাজ দ্বারা নির্দিষ্ট গতানুগতিক ভূমিকা যন্ত্রের মত পালন করে যায়।

হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মহারাষ্ট্রের দ্বাদশ শ্রেণির একটি সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে মেয়েদের সৌন্দর্যহীনতাকে দায়ী করে পণপ্রথার মত ঘৃণ্য অপরাধকে সমর্থন করা হয়েছে! এই জঘন্য অপরাধের নিন্দে করার পরিবর্তে, বইটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যে সব মহিলারা দেখতে 'সুন্দর' নয়, তাঁদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবার ফলেই এই প্রথাটি সমাজে বিদ্যমান! কুরূপকে কি কখনও সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব? সৌন্দর্য একটি সামাজিক নির্মাণ নয় কি? প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রের এই পাঠ্যপুস্তক সামাজিক সৌন্দর্যের মানদণ্ডে নির্ধারিত কুরূপাদের দোষী সাব্যস্ত করে পণ প্রথার মত ভয়ঙ্কর অপরাধকে ন্যায্যতা প্রদানের চেষ্টা করে চলেছে। ভাবলে চিন্তা হয়, কতজন ছাত্রছাত্রী এই অর্থহীন বিষয়গুলি পড়বার সময় লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে পণপ্রথার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করবে! কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিদ্যালয়গুলি

বাস্তববাদী সমালোচনার পরিবর্তে মুখ বুজে ‘প্রশ্ন না করা’ বশ্যতাকেই পুরস্কৃত করে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে এসেছে। সেখানে রাজস্থান বোর্ডের নবম শ্রেণির একটি হিন্দি পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরা হয়েছে। সেই উদ্ধৃতাংশটিতে যে কেবল গৃহবধূদের মজুরীহীন গৃহশ্রমকে হীন প্রতিপন্ন করা এবং তার অবমূল্যায়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা-ই নয়, সেইসাথে কদর্য ভাষায় তাঁদের গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, বিবাহিত মহিলারা নাকি গাধার চাইতেও খারাপ। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, গাধারা সবসময় তাদের প্রভুদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। অন্যদিকে বিবাহিত মহিলারা নিজ অধিকারের দাবিতে নানান অভিযোগ করেন এবং শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান। অনেকক্ষেত্রেই তারা তাদের ‘প্রভু’ (পড়ুন স্বামী)-কে অমান্য করেন। নারীকে পুরুষের মালিকানাধীন করে রাখবার অর্থাৎ নারীর পণ্যায়নের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধরনের পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের মনে নারীবিদ্বেষী মনোভাবের সঞ্চার করে এবং ক্রমশ তারা নারীদের নিকৃষ্ট জীব বলে মনে করতে শুরু করে। দুঃখের ব্যাপার, মুক্ত চিন্তার ধারক ও বাহক পাঠ্যপুস্তক এখানে লিঙ্গ বৈষম্য প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে!

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় আরেকটি খবর অনুযায়ী, ছত্তিসগড়ের দশম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে, কর্মরতা মহিলারাই নাকি দেশে এমন উচ্চ হারে বেকারত্বের মূল কারণ! যুদ্ধ থেকে প্রেম, সব রকমের সমস্যার পেছনে আছেন নারীরাই— এই ধারণাটি বহু প্রাচীন। তাই দেশের বেকারত্বের পেছনেও যে নারীদের দোষ খুঁজে দেখা হবে এ আর নতুন কী! সমস্যা হল, যখনই বেকারত্বের কথা উল্লেখ করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করে নেওয়া হয়, পুরুষেরাই কেবলমাত্র বেকার, নারীরা নয়। নারীদের বেকারত্ব সমাজের জন্য মোটেই বিপদজ্জনক বলে মনে করা হয় না। এতে কর্মরতা নারীদের শ্রমের মূল্য হ্রাস পায়। সেইসাথে কর্মরতা নারীরা যখন সমাজের বিপদের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হন, তখন সম্ভাব্য নারী কর্মীরা শ্রমশক্তিতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন সমাজের চাপে।

এই ধরনের পাঠ্যবিষয়গুলি যে কেবল লিঙ্গ বৈষম্যকেই আরও চওড়া করে তা-ই না, সেই সাথে সমাজের এমন গৎবাঁধা ধারণাগুলির ভিতকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি ইত্যাদির ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষম্য ও পার্থক্যকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে, তা শিক্ষকেরা বুঝে উঠতে পারেন না। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। পরীক্ষামূলকভাবে বহুবার নতুন শিক্ষানীতি চালু করা সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একাধিক কারণে তেমনভাবে পরিবর্তিত হয়নি— একটি বিশেষ কারণ হল শিক্ষকেরা পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত নন। যদিও বা শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করা হয়, দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাকর্মসূচিতেই লিঙ্গ নিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব রয়েছে। ফলস্বরূপ আমাদের দেশের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের লিঙ্গ নিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নিঃসন্দেহে আধুনিক করা হয়েছে, কিন্তু ব্যাচেলর অব এডুকেশনের পাঠক্রম কম বেশি একই রকম রয়ে গিয়েছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নতির কথা ভেবে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের গুরুত্ব বুঝতে হবে শিক্ষক ও শিক্ষানীতি প্রণেতাদের। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক একটি কম্পাসের মত কাজ করে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকটি লিঙ্গ সংবেদনশীল না হলে আগামী প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট চিন্তাধারায় সংশোধন আনা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকগুলিকে ত্রুটি মুক্ত করতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে লিঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পাঠ্যক্রম প্রণেতাদের সর্বদা লিঙ্গ সাম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

সংক্ষেপে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যৌনবাদী চিন্তাধারা প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে এবং লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বিদ্যালয়গুলি এই নারীবিদ্বেষী ধারণাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রধান কাণ্ডারিতে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের কারণ হল এই লিঙ্গ বিভেদকামী পাঠ্যবিষয়গুলি সরকার অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের অংশ, যা শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের কোমল মনে আমূল প্রোথিত করে দিচ্ছেন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। একটি গোটা প্রজন্ম এই ত্রুটিযুক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ে বড় হচ্ছে। ফলস্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের প্রগতশীল চিন্তাধারার পথ ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সম্ভবত তাদের পূর্বসূরিদের মতই, এই লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট ধারণাগুলি অন্তরে ধারণ করে ভবিষ্যতে নিজেদের জীবনেও সেসব প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে তারা!

খনা, এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার অনিশ্চিত জীবনগাথা

নিজের সময়ের চাইতে অনেকগুণ এগিয়ে থাকা মানুষকেই তো আমরা আধুনিক মানুষ বলি। খনা তেমনই এক নারী। আমরা সাধারণ মানুষেরা খনাকে যত না চিনি, খনার বচনের সঙ্গে তার চাইতে অনেক বেশি পরিচিত। আজও গ্রামে-গঞ্জে কিম্বা মা-দিদিমা-ঠাকুমাদের মুখে মুখে খনার প্রচলিত ছড়াগুলো সমানভাবে জনপ্রিয়।

তবে এই খনার জীবন মোটেও সরল ছিল না, প্রতিপদে নানা পরীক্ষার মুখে তাঁকে পড়তে হয়েছে। বিতর্ক আছে তাঁর জন্মকাল নিয়েও। কোনও কোনও গবেষক মনে করেন আনুমানিক ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝের কোনও এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খনা। অন্যদিকে আবার একদল মনে করেন জ্যোতিষবিদ বরাহের জীবনকাল ৫০৫ থেকে ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ। মিথ অনুসারে যদি বরাহ খনার শ্বশুর হন, তবে দুজনের মধ্যে এত ব্যবধান অসম্ভব।

প্রচলিত মত অনুসারে খনার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের দেউলি গ্রামে। পিতা ছিলেন অটনাচার্য। খনার একটি বচনেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়, “আমি অটনাচার্যের বেটি, গণতে গাঁথতে কারে বা আঁটি।”

আরেকটি মতে খনা ছিলেন সিংহলরাজ কন্যা। নাম ছিল লীলাবতী। পরবর্তীতে নাম হয় খনা। ছোটবেলা থেকেই প্রজ্ঞা, মেধা ছিল অসম্ভব বেশি।

বিশেষ করে গণনা করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মতো পারদর্শী খুব কমই ছিল। আর এই জানাই বোধহয় ওর কাল হল।

খনা সম্পর্কে জানার আগে ওঁর জীবনের শুরুর দিকটা একটু জানা প্রয়োজন— বরাহ ছিলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভাসদ। বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ ছিলেন তিনি, তাঁরই ছেলে মিহির। বরাহ তাঁর পুত্রের জন্মের পর গণনা করে বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলের আয়ুষ্কাল মাত্র এক বছর। নিজের গণনার ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই তিনি মনের দুঃখে ছেলেকে তামার পাত্রে চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন এই বিশ্বাসে যে ছেলেটি এভাবে বেঁচেও যেতে পারে। তারপর কেটে গিয়েছে বহু বছর। বরাহ আর খবর পাননি ছেলের, ধরেই নিয়েছেন তাঁর পুত্র মারা গিয়েছে।

এদিকে ওই তামার পাত্রটি ভাসতে ভাসতে চলে যায় বহুদূর, তা খুঁজে পান খনার পিতা। তিনি ওই ছেলেটিকে ও নিজের মেয়ে খনাকে একসঙ্গে একইভাবে মানুষ করতে লাগলেন। একই সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলেন মিহির ও খনা। এক সময় বিয়েও হল তাদের। বেশ সুখেই কাটছিল এদের দুজনের বিবাহিত জীবন। এরপরই খনা গণনার মাধ্যমে জানতে পারলেন, মিহির আসলে বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ বরাহের পুত্র। দুজনে দেখা করলেন বরাহের সঙ্গে, কিন্তু তিনি তো মানতে নারাজ, নিজের গণনার ওপর অগাধ বিশ্বাস যে তাঁর! খনা তখন আবার বসলেন গণনায়, হিসেব করে বের করলেন, এক বছর নয় মিহিরের আয়ু একশ বছর। তিনি বরাহকে বললেন, ‘কীসের তিথি কীসের বার, জন্ম নক্ষত্র কর সার, কী করো শ্বশুড় মতিহীন? পলকে আয়ু বারো দিন!’

অবশেষে বরাহ মেনে নিলেন খনার গণনা। এরপর খনা আকাশের তারা গতিবিধি গণনা করে কৃষকদের সমস্যার সমাধানও করেছিলেন, যার বরাহ ও মিহিরের মতো জ্যোতিষবিদও পেরে ওঠেনি। সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নজরে পড়ে যায় খনা। রাজা

তাঁর নবরত্ন সভার 'দশম রত্ন' বলে ভূষিত করেন খনাকে। খনার বেশিরভাগ বচনই কৃষিকাজ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত। আজও যা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বেশ কিছু বচন তো আজও আমাদের মুখে মুখে ফেরে। যেমন বাড়ি থেকে কোথাও বেড়োনোর আগে বাড়ির বয়স্করা আজও বিধান দেন, 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।' শীতকালে বৃষ্টি নিয়েও খনার একটি বচন বিখ্যাত, সেটি হল, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজা পুণ্যি দেশ', আবার কখনও তিনি বলেন, 'যা-ই করিবে বান্দা তা-ই পাইবে, সুঁই চুরি করিলে কুড়াল হারাইবে।' এমন আরও কত বচন, যা আমাদের বিশেষত বাঙালির যাপনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কখন, তা জানাই যায় না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খনা জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি সকলের নজরে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ঈর্ষান্বিত হন স্বয়ং বরাহ। তিনি খনাকে আর সহ্যই করতে পারছিলেন না। তাই ঠিক করলেন খনার বচনের মূল উৎসকেই সমূলে উৎখাত করে ফেলতে হবে। তাই তিনি পুত্র মিহিরকে আদেশ দিলেন খনার জিভ কেটে নেওয়ার জন্য। পিতৃভক্ত মিহিরও আদেশ পালন করলেন। জিভ কাটার পরও কয়েকদিন বেঁচে ছিলেন খনা, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে ক্রমশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এই করুন মৃত্যু কাহিনি নিয়েও আরেকটি মিথ প্রচলিত, খনার খসে পড়া সেই জিভটি নাকি তখনই এক টিকটিকি খেয়ে ফেলে। তাই তো আমরা আজও কোনও কথা বললে যদি টিকটিকি টিক টিক করে ওঠে, আমরা ভাবি 'ঠিক, ঠিক।' এভাবে মরে গিয়েও বেঁচে আছে খনা, আজও, হয়ত থাকবেন কালও।

উড়িয়া মতে মনে করা হয় 'খনা' শব্দের অর্থ বোবা। জিভ কেটে নেওয়ার সময় নাকি মিহির কিছু কথা বলার সুযোগও দিয়েছিলেন খনা ওরফে লীলাবতীকে। কিন্তু এর বেশি কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যে মিহির প্রায় জন্মলগ্ন থেকে খনার সঙ্গে বড় হলেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁর মনে কি খনার জন্য কোনও প্রেম, কোনও করুণা বা সহমর্মিতা জেগে ওঠেনি? জিভ কাটার সময় কি চিক চিক করে ওঠেনি চোখের কোল? উত্তর মেলে না এসব প্রশ্নেরও। যদিও খনাকে মেরে ফেললেও তাঁর রেখে যাওয়া বচনগুলোকে নস্যাৎ করতে পারেননি কোনও বরাহ-মিহির!

খনা নামের কোনও অস্তিস্ত ছিল কিনা কিম্বা থাকলে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাঁর সঙ্গে বরাহ বা মিহিরের সম্পর্ক কেমন ছিল সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে ধোঁয়াশা, বিতর্ক। তবু আমাদের ভাবতে ভাল লাগে, সেই কোন প্রাচীনকালে এক প্রাজ্ঞ নারী নির্ভুল গণনায় মাত করে দিচ্ছেন তাবড় তাবড় পণ্ডিতদের, বিতর্কে হারিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের। যুগযুগ ধরে যেখানে নারীদের মাথা নোয়ানোই নীতি বলে জেনে এসেছে সবাই, সেখানে এই পুরাণের নারী প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, তাই না?

শাঁওলি দে

অনিবার্য কারণবশত এই সংখ্যায় 'ডুয়ার্সের মেয়েবেলা' প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় আবার কলামটি প্রকাশিত হবে।

রাসায়নিক রস

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

স্থান: কৈলাস। ১১ই ভাদ্র ১৪২৬।

অসুর: এই কেতো! ক্রিম মাখা বাদ দিয়ে মা-কে একটু ডেকে দে তো!

কার্তিক: মা অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। ওরে বাবা! এদিকেই আসছে!

দুর্গা: হতচ্ছাড়া কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ! কোনও গুণ নাই সোয়ামির কপালে আগুন!

সরস্বতী: কেন কী হয়েছে?

গণেশ: বাবা অনলাইনে হাল ফ্যাশানের কঙ্কে অর্ডার করেছিল। কুরিয়ার ভুল করে চিনে চলে গেছে।

লক্ষ্মী: এতে বাবার রাগ হয়। তিন নম্বর চোখ দিয়ে এনার্জি বেরিয়ে যায় খানিকটা।

গণেশ: কালার গাইডেড এনার্জি। মা তিনটে ভাল শাড়ি শুকোতে দিয়েছিল। ভস্ম হয়ে গেছে।

দুর্গা: তোদের বলে রাখছি— ওই ভস্ম থেকে শাড়ি যদি ফের না সৃষ্টি হয় তবে যেন মনে রাখে অমন চোখ আমারও একটা আছে! (অসুরের প্রবেশ) তা এই ব্যাটা অসুর! এখন এলি কেন? পুজোর এখনও দু-পক্ষ বাকি আছে। পরে আসিস!

অসুর: কথা খুব গুরুতর মা! আমি কি এবারেও ত্রিশূলের খোঁচাতেই মরব?

দুর্গা: এ কথার মানে?

অসুর: না মা! ভেবে দেখুন! বকাসুর যখন অত্যাচার করছিল তখন তো আপনি চুপ করেছিলেন, আমার বেলায় ত্রিশূল কেন? এটা কি সিলেক্টিভ অসুরবধ নয়?

কার্তিক: এ আবার কী কথা?

অসুর: সেই কবে থেকে আপনার ফ্যামিলি আমাকে মারছে। কেন? স্বর্গে আর কোনও ফ্যামিলি ছিল না?

সরস্বতী: তুমি বোধহয় জান না যে এবার তুমি ত্রিশূলে মরছ না।

অসুর: ওমা! তাই?

লক্ষ্মী: ফ্যামিলির হাতেও মরছ না।

অসুর: তার মানে ভাল দিন আসছে!

গণেশ: মেকিং পাসড্ আওয়ে একর্ডিং টু কন্সটিটিউশনাল ডেমোক্র্যাটিক অথরিটারিয়ান এথিক্স।

অসুর: এটা কোন বেদে আছে মা?

দুর্গা: সব বেদে বাছা! একে সংক্ষেপে বলে গণধোলাই।

অসুর: অহো! কী ক্রিটিকাল উভয় সঙ্কট! একদিকে ফ্যামিলি অন্য দিকে গণধোলাই।

ছেলেমেয়েরা: ওই যে, বাবা আসছে! বাবা আসছে!

শিব: তখন মাথাটা গরম হয়ে গেছিল কেন কি—!

অসুর: এবার গিয়ে 'কেন কি' বলে দেখুন, বাঙালি কেমন রিঅ্যাক্ট করে!

শিব: বলিস কী!! কথা কী ভাবে বলব তারও নিয়ম হয়েছে নাকি? সত্যি পারু! কে টানে, কার হয়!

দুর্গা: এই ব্যাটা অসুরের লজিক শুনেছ? মনে হচ্ছে ঠাটিয়ে একটা চড় মারি!

অসুর: আমাকে অবজ্ঞা করছেন তো? নতুন নিয়ম চালু হলে তো সিংহবাবুও যেতে পারবেন না!

সিংহ: কেন? কেন?

অসুর: বাঙালি হল বাঘ। বেঙ্গলে সিংহ নেই। গুজরাটে আছে।

সিংহ: বেঙ্গলে নেই কেন?

অসুর: ওমা! এত জান, এটা জান না যে এর জন্য জহরলাল দায়ি? অবশ্য এই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। রোজ টক শো হচ্ছে।

গণেশ: নীল সাদারা বলছে বাঘ হল বাঙালিত্বের প্রতীক। ডুয়ার্সে তুমি ব্যাঘ্রাসীনা। সেটাই ঠিক। গেরুয়ারা বলছে, দরকারে গুজরাট থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে সিংহ পাঠান হবে। সব মিলিয়ে পুজো কমিটি খুব টেনশনে। ঠিক হয়েছে সব কমিটির সব সদস্যরা নীল প্যান্ট, সাদা শার্ট আর গেরুয়া টাই পরে পুজো পরিচালনা করবে। তোমার ব্লাউজের নতুন ডিজাইন হয়েছে। পাঁচটা হাতা নীল সাদা, পাঁচটা গেরুয়া।

অসুর: এদ্দিন যা হয়েছে ভুলে যান মা! এবার আপনার দু-পাশে দুটো করে চারটে কার্তিক থাকবে। এর জন্য আইন পাস হল বলে।

সরস্বতী: এটা বুঝলাম না অসুর মামা!

অসুর: যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই। কেতো দেবসেনাপতি। গণশার জ্ঞান, সরোর বিদ্যা, লক্ষ্মীর শ্রী— এসব বাড়তি।

শিব: হায়! কে টানে, কার হয়!

দুর্গা: বাপের বাড়ির হাল তো ভাল নয়! ওগো! শুনছ?

শিব: শুনছি না টানছি।

দুর্গা: অসুরটাকে কিছু বোঝাও!

শিব: বোঝানোর কিছু নেই। পাকশালা থেকে নোড়াটা এনে মাথায় দুটো ঘা দিয়ে বিদেয় কর।

অসুর: না না দেবাদিদেব! স্বপাক, নাপাক, পাকস্থলী, পাকশাল ইত্যাদি পাকিস্তানের হয়ে বলার লক্ষণ। আর্বান নকশাল। এ ছাড়াও শেষে মান আছে এমন শব্দ, যেমন, হনুমান, ইমান, বর্ধমান, মুসলমান— এসব সংখালঘু তোষণের লক্ষণ। কেউ কেউ তো রামায়ণ থেকে হনুমান চরিত্র বাদ দেওয়ার পক্ষে। —আরে! এ কী! নোড়া নিয়ে আসছেন কেন?

(পলায়ন এবং তদাবস্থায়) এদিকে পরিবারতন্ত্র, ওদিকে গণধোলাই মাঝে নোড়ার গুঁতো! এই যে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেশকে বিচার করে দেখছি, এর কোনও মূল্য নেই গা?

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. readbengalibooks.com**

পাঠকের পর্যটন

কোচবিহার-শিলিগুড়ি নতুন এসি বাস

শোভন রায়

গত পঞ্চাশ বছরের জ্ঞানদশায় দেখেছি ডুয়ার্স বাংলার এই হার্টলাইন বারবার বিঘ্নিত হতে। অথচ এই পথেই গোটা উত্তর-পূর্বকে জুড়েছে বাকি দেশের সঙ্গে। হাজারে হাজারে লরি এ পথ দিয়ে নিয়ে যায় মানুষের খাদ্য-বস্ত্র এবং বাসস্থান গড়বার সামগ্রী, পরিবহণের যানবাহন ও যন্ত্রাংশ নিয়ে। অথচ অবাক হতে হয় এই পথের হাল কোনওসময়েই ঠিক থাকতে দেখে নি এখানকার মানুষ। কোচবিহার-ফালাকাটা-ধুপগুড়ি-ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির এই মহাব্যস্ত পথে সড়ক পরিবহণ বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। মানুষের দুর্ভোগ মাত্রাছাড়া হতে হতে এখন কেমন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। রাজ্য পথ-নির্মাণ দপ্তরকে এখন আর পুরোপুরি দোষারোপ করা যায় না, কারণ এ পথের সিংহভাগই এখন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে। পথের কাজ এখনও বাকি অনেকটাই, সেইসব অংশের অবস্থা শোচনীয়। শিলিগুড়ি-কোচবিহার বা শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার রাস্তায় এসময় বাসের ওপর আর ভরসা করে না বহু মানুষ, বেছে নেয় রেলপথকেই, যদিও এ পথে লোকাল ট্রেন সার্ভিসও অতীব নগণ্য।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পক্ষ থেকে এপথে চালু হয়েছিল একজোড়া এসি বাস। যুগের প্রয়োজনে এবং মৃতপ্রায় সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে তুলবার অভিপ্রায়ে নতুন সরকারের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, নতুন প্রযুক্তির বাস মেরামতির কিংবা কর্মসংস্কৃতির অভাবে এবং পথঘাটের শোচনীয় অবস্থায় তকতকে বাসগুলির অবস্থা করুণ হতে হতে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি বন্ধই হয়ে গেছে এনবিএসটিসির শিলিগুড়ি-কোচবিহার এসি বাস সার্ভিস। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা ঠিক না হলে এই বাস চালানো যাবে না, কারণ মেরামতির খরচ অসম্ভব বেশি।

কিন্তু তার মধ্যেই আশার আলো জাগিয়ে রাখে অসরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলির মনোবল। কোচবিহারের ত্রিনয়নী ট্রাভেলস গত ২৭ অগাস্ট চালু করল ৪২ আসন বিশিষ্ট এসি বাস। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন জেলা সমাহর্তা কৌশিক সাহা। রোজ সকাল সাড়ে ন'টায় কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়ছে এই বাস। রাস্তার প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ফালাকাটা-ধুপগুড়ি-ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে মোটামুটি নির্ধারিত সময়েই শিলিগুড়ি পৌঁছচ্ছে এই বাস। ফের শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে টার্মিনাস থেকে ছাড়ছে বিকেল সাড়ে তিনটেয়। ভাড়া মাত্র দুশো টাকা, সরকারি পরিবহণ নিগমে যা ছিল আরও পঁয়ষট্টি টাকা বেশি। পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হল, গরম কমলেই এসি বাসের চাহিদা কমে যায়, সেইজন্য আপাতত ভাড়া কম রেখে স্থানীয় যাত্রীদের অভ্যেস করানোটা জরুরি। কারণ এসি শুধু গরম থেকেই নয়, আপনাকে বাঁচায় পথের ধুলো ও ক্লান্তি থেকেও। শিলিগুড়ি গিয়ে কাজকর্ম সারতে বাড়তি এনার্জি মেলে, কিংবা ফেরার পথে এসিতে জার্নি পথের যানজটের ক্লান্তি অনেকটাই লাঘব করতে পারে। তাঁদের এবং আরও অনেকেরই আশা, স্থানীয় নিত্যযাত্রী এবং পর্যটকদের মধ্যে এই বাসের চাহিদা বাড়বে। যা আরও এসি বাস নামাতে উৎসাহিত করবে বাস মালিকদের। অনেকেরই মতে, সরকারি এসি বাসে যেটা বড় সমস্যা তা ছিল বাসের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। এসি বাসে পরিচ্ছন্নতা না থাকলে তার ফলে নানা সংক্রমণ ছড়াতে পারে। অসরকারি বাসে সেটুকু আশা করা যায়। অর্থাৎ ডুয়ার্সের স্থানীয় পরিবহণে নতুন অধ্যায় চালু হল নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রতিকূল পথে এই সার্ভিস জারি রাখাই তাদের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ।

যে কথা বলা হয় নি, এসি বাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শীঘ্রই শুরু হচ্ছে অনলাইন বুকিং সার্ভিস। তার আগে কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন ৮৫৯৭৪ ২৩৫৫৫

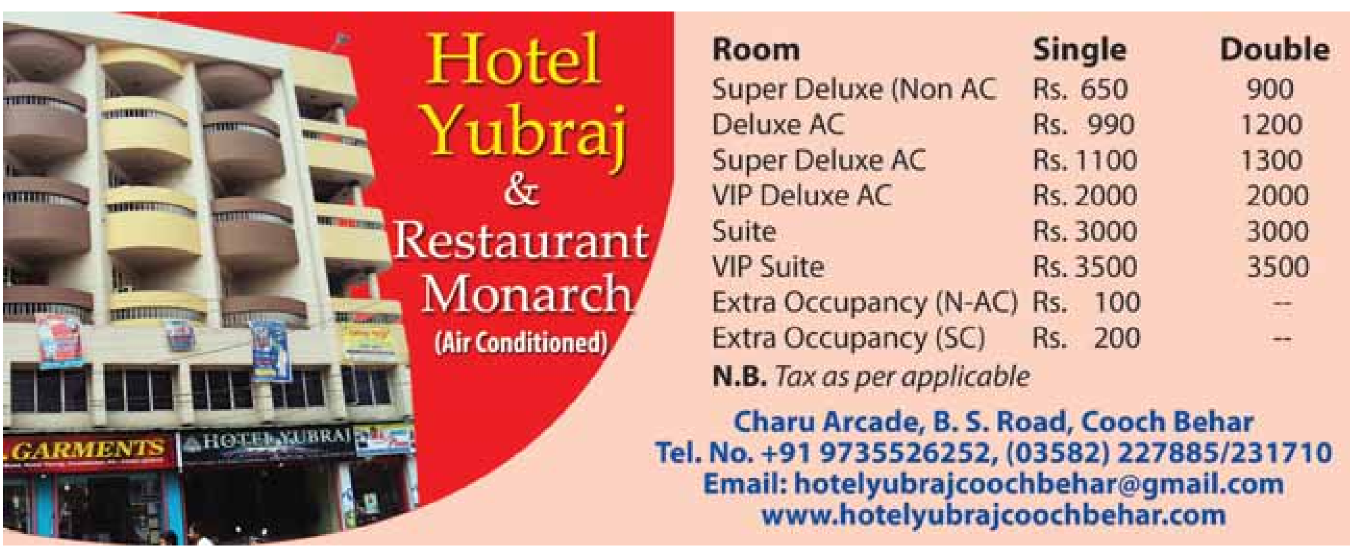

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.